ড. হিশাম আল-আওয়াদি

বি স্মার্ট উইথ মুহাম্মাদ ﷺ

অনুবাদ: মাসুদ শরীফ

লেখক সম্পর্কে

ড. হিশাম আল-আওয়াদির জন্ম কুয়েতে। পড়াশোনা করেছেন ইতিহাস, রাজনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও যোগাযোগ বিষয়ে। অধ্যয়নের সময়টা কাটিয়েছেন ক্যামব্রিজ, এক্সেটারসহ আরো কয়েকটি ব্রিটিশ ইউনিভার্সিটিতে।

পিএইচডি ডিগ্রিধারী এই গবেষক একসময় অধ্যাপনা করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি আর যুক্তরাজ্যের এক্সেটার ইউনিভার্সিটিতে।

ড. হিশামের আগ্রহের বিষয় মানুষকে অনুপ্রাণিত করা, উদ্দীপ্ত করা। নিজে শেখা, অন্যকে শেখানো।

বর্তমানে আমেরিকান ইউনিভার্সিটি অফ কুয়েতে ইতিহাসের অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত। শিক্ষকতা পেশায় কৃতিত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ তার ঝুলিতে আছে 'ইনোভেটিভ লেকচারার অ্যাওয়ার্ড (২০১৩)' এবং 'ফ্যাকাল্টি মেনটরশিপ অ্যাওয়ার্ড (২০১২)'।

অনুবাদক সম্পর্কে

আমার প্রথম জন্ম হয়েছিল রাত ১.০০ টার দিকে। যে কারণে কেউ বলে আমার জন্ম সোমবারে, কেউ বলে মঙ্গলবারে। প্রথমবার জন্মেছিলাম মানুষ হয়ে। সে ১৯৮৭ সালের কথা। আমার দ্বিতীয় জন্ম ২০১১ সালের শেষের দিকে। এবারের জন্ম মুসলিম হয়ে। মুসলমানের ঘরে জন্মেও প্রথম দফায় মুসলিম হতে পারিনি।

প্রগতির ঠিকাদারেরা নাক সিটকাবে আমি মানুষ নই বলে। আমি হাসব ওদের মতো উনমানুষ না-হয়ে মুসলিম হয়েছি বলে।

নিজের অনিচ্ছায় পড়াশোনা করেছি ইলেট্রনিক্স অ্যান্ড ইলেট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে। সেই পাট চুকিয়ে এখন পুরোদস্তুর পাঠক-লেখক-অনুবাদক।

আমি আসলে অনুবাদ করি না। ভিন ভাষার ভাবটাকে নিজের ভাষার ঢঙে রুপান্তর করি মাত্র। সেটা ঠিক অনুবাদ হয় কিনা তা নিয়ে অনেকে আঙুল তুলতে পারেন। কিন্তু সাহিত্যের ভাষাকে আমি ভাব-বিনিময় বলেই মানি।

এক স্ত্রী, দুই কন্যা, বাবা-মা, বোনদের নিয়ে দুনিয়ার মুসাফিরখানায় বেশ আছি। সব তারিফ আল্লাহর।

বি স্মার্ট উইথ মুহাম্মাদ ﷺ

বি স্মার্ট উইথ মুহাম্মাদ ﷺ

ড. হিশাম আল আওয়াদি

অনুবাদক: মাসুদ শরীফ

বি স্মার্ট উইথ মুহাম্মাদ ﷺ

ড. হিশাম আল আওয়াদি
অনুবাদকঃ মাসুদ শরীফ

গার্ডিয়ান পাবলিকেশন্স

৩৪, নর্থব্রুক হল রোড, (২য় তলা)

বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০

✆ ০১৭১০-১৯৭৫৫৮, ০১৯৯৮-৫৮৪৯৫৮
০২-৫৭১৬৫৫১৭

guardianpubs@gmail.com
www.guardianpubs.com

অনলাইন পরিবেশক :

www.rokomari.com
www.boibajar.com

প্রথম প্রকাশঃ ৩০ নভেম্বর ২০১৭ ইং

শব্দ বিন্যাসঃ মোঃ জহিরুল ইসলাম

প্রচ্ছদঃ সালাহউদ্দিন জাহাঙ্গীর

মুদ্রণঃ মোঃ আমিনুল ইসলাম

মূল্য : ২৫০.০০

ISBN-978-984-92959-5-2

Be Smart With Muhammad (SW) by Dr. Hisham Al Awadi.
Published by Guardian Publications, Price Tk. 250 Only.

প্রকাশকের কথা

তিনি 'উসওয়াতুন হাসানা'। কে তিনি? বিশ্ব মানবতার মহান শিক্ষক, সাইয়্যেদুল মুরসালিন, তিনি মুহাম্মাদ মোস্তফা ﷺ। তাঁর নবুওয়াতি জীবনের তেইশ বছরই কি কেবল অনুসরণীয় মডেল? পৃথিবীর সেরা মানুষটির জমিনে পা রাখার পর থেকে চল্লিশ বছর পর্যন্ত সময়কাল কি 'উসওয়াতুন হাসানা' নয়? নিশ্চয়। প্রিয় নবিজির পুরো তেষট্টি বছরের জীবনই পৃথিবীবাসির জন্য সর্বোত্তম আদর্শ।

বাবা হারানো শিশুদের সামনে কখনো চার বছরের পিতৃহারা শিশু মুহাম্মাদকে দাঁড় করিয়েছেন? বাবা-মা হারানো এতিম শিশুর সাথে কখনো কি পাঁচ বছরের এতিম মুহাম্মাদের বন্ধুত্ব গড়ে দিতে পেরেছেন? আমাদের টিনএজ প্রজন্ম একুশ শতকের আজকের দিনে যেসব চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি, কিশোর মুহাম্মাদ সাড়ে চৌদ্দশ বছর আগে ঠিক এমনই কিছু চ্যালেঞ্জ সামলিয়েছিলেন দারুণভাবে। তিনি তারুণ্যের সঙ্কট মোকাবিলা করেছেন, তারুণ্যের রক্ত ও শক্তি পরিশীলিত সমাজ গঠনে কাজে লাগিয়েছেন। আজকের তরুণরা যুবক মুহাম্মাদকে পড়ে ইমপ্রেস না-হয়ে পারবেই না! নবুওয়াতের আগেই একজন ক্রিয়াশীল ইফেক্টিভ মানুষ হিসেবে সমাজে জায়গা করে নেওয়া মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ ত্রিশের কোঠার টগবগে মানুষগুলোর রোল মডেল না-হয়ে কি পারে? ওহী পাওয়ার পরের মুহাম্মাদ ﷺ-এর যাপিত জীবন, কর্মপদ্ধতি আর সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়া অবশ্যই অতুলনীয়!

রাসূল ﷺ-এর সীরাতকে নানাভাবে লিখা হয়েছে। আমেরিকান ইউনিভার্সিটি অব কুয়েতের প্রফেসর ড. হিশাম আল আওয়াদি তাঁর 'Muhammad: How He Can Make You Extra-Ordinary' বইয়ের মাধ্যমে এক নতুন ধারায় রাসূল ﷺ কে উপস্থাপন করেছেন। বইটির মাধ্যমে শৈশবের নবিজিকে দেখিয়ে শিশুদের করণীয় খুঁজে দিতে পারবেন, বাবা-মা তার সন্তানকে প্রতিপালনের ধারনা নিতে পারবেন, তরুণরা তাদের আসন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার উপাত্ত খুঁজে পাবেন। উদ্ভূত সমস্যার সমাধানে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্টাইল যে কেউ নিজের জীবনে প্রয়োগ করার পথরেখা পাবেন। রাসূল ﷺ-এর মত নিখুঁত ও স্মার্ট হওয়া হয়ত অনেক কঠিন; এই বই আপনাকে অন্তত তার কাছাকাছি নিয়ে যেতে অনুপ্রেরণা যোগাবে। অসাধারণ এই বই 'বি স্মার্ট উইথ মুহাম্মাদ ﷺ' নামে অনুবাদ করেছেন প্রিয় ভাই মাসুদ শরীফ। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে উত্তম জাযা দান করুন। বইটি পাঠকদের হাতে তুলে দিতে পেরে গার্ডিয়ান পাবলিকেশন্স অত্যন্ত গর্বিত ও উচ্ছসিত। বইটি আপনার স্মার্টনেস বাড়াতে সামান্যতম সহায়ক হলেও আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক হবে।

নূর মোহাম্মাদ আবু তাহের
বাংলাবাজার, ৩০ নভেম্বর, ২০১৭

অনুবাদকের কথা

নিখাদ আত্মোন্নয়নমূলক বই। পশ্চিমে এ ধরণের বই প্রচুর। ওখানে এসব বইয়ের কাটতিও থাকে অনেক। বাংলায় সে তুলনায় এই ধরণের বই আঙুলের কড়িতে গোনা যাবে। পশ্চিমা সমাজের বাইরের মেকআপটা নিলেও, ভেতরের সৌন্দর্যটা নিতে বড় অনীহা আমাদের।

এধরণের বইগুলো শতভাগ প্রাকটিক্যাল বা বাস্তবসম্মত। কীভাবে কী করবেন, কীভাবে নিজের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনকে উন্নত করবেন তা-ই হাতেকলমে বলা।

পশ্চিমা বইগুলোতে এসব বলা থাকে পাশ্চাত্যের বিভিন্ন গবেষণা এবং তাদের নিজস্ব আদর্শ ও পদ্ধতির আলোকে। কিন্তু এই বইয়ে পশ্চিমা গবেষণার সাথে অভূতপূর্ব মেলবন্ধন হয়েছে নবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর জীবনের। আমার জানামতে এরকম বই এটাই প্রথম।

নবিজি ﷺ নবুওয়াত পেয়েছেন চল্লিশ বছর বয়সে। কিন্তু নবি হওয়ার আগ পর্যন্ত সময়টা ছিল উনার প্রস্তুতিকাল। এই দীর্ঘসময় জুড়ে আল্লাহ নিজের হাতে গড়েছেন তাকে। আমি অনেককে দেখেছি, দীর্ঘকাল ইসলাম চর্চা করার পরও নবিজির আদলে নিজেকে পুরোপুরি সাজাতে পারছেন না। খাবারে নুন কম হলে স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া। বাচ্চাকাচ্চাদের সঙ্গে নির্দয় আচরণ। কাজের লোকের সঙ্গে অকথ্য ব্যবহার। বসের সামনে ব্যক্তিত্বহীন হুজুর হুজুর। অধীনস্থের উপর জোর গলা। খাবারদাবারে নিয়ন্ত্রণ নেই। আচার ব্যবহারে চলনে-বলনে মাধুর্য নেই। আমরা জানি নবিজি ব্যক্তিজীবন থেকে সামাজিক জীবন প্রতিটি ক্ষেত্রেই ছিলেন পরাকাষ্ঠা। কিন্তু কোথাও বলা হয় না কীভাবে তিনি তা হলেন? দেখানো হয় না আমাদের সময়ে কীভাবে আমরা উনার পথরেখা অনুসরণ করে স্মার্ট হবো।

নবিজি ﷺ কী ছিলেন, তা সবাই কমবেশি জানি। কীভাবে সেই 'কী' হলেন তা জানতে এবং হতে- এই বই হবে আপনার প্রথম ধাপ।

মাসুদ শরীফ
masud.xen@gmail.com

লেখকের কথা

জীবনে যারা বিশেষ কিছু হতে চান, এই বইটি তাদের জন্য। বইটির পরতে পরতে রাসূল ﷺ-এর জীবনের এমন সব ঘটনা থাকবে, যেগুলো মানুষকে অনুপ্রেরণা দিবে দারুণভাবে। অবলীলায় তারা তাঁকে গ্রহণ করবেন অনুকরণীয় আদর্শ হিসেবে।

বইটিতে তাঁর নবী হওয়ার আগের জীবন বেশি গুরুত্ব পাবে। আমরা দেখব শিশুকাল থেকে কিভাবে তিনি নিজের ব্যক্তিত্বকে গড়ে তুলেছেন। টিনএজ বয়সের চ্যালেঞ্জগুলো কিভাবে মোকাবিলা করেছেন। তরুণ বয়সেই কিভাবে সমাজে নেতা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন।

সাধারণত জীবনীগ্রন্থগুলোতে যেভাবে বিভিন্ন ঘটনা বর্ণনা করা হয়, এখানে ইচ্ছে করেই সেগুলো সেভাবে বর্ণনা করা হয়নি। এই বইয়ে আমাদের ভাষা অনেকটা ঘরোয়া। অনেকটা সাদাসিধা।

ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে রাসূল ﷺ এর ব্যাপারে যেসব জীবনী লেখা হয়, সেগুলোর বেশিরভাগে দুটো জিনিস হামেশা পাওয়া যায়; রাসূল ﷺ-এর ৪০ বছরের পরের জীবন আর পাঠকদের মধ্যে তাঁর ব্যাপারে সম্ভ্রম জাগানো।

কিন্তু এ ধরনের লেখনীতে তরুণ পাঠকেরা নিজেদের কমই খুঁজে পায়। বইগুলোতে তাঁকে এতটাই নিখুঁত পুরুষ হিসেবে তুলে ধরা হয় যে, অনুকরণীয় আদর্শ হিসেবে তাঁকে গ্রহণ করতে বেগ পেতে হয়। তরুণরা অনেক সময়ই তাদের জীবন ঘনিষ্ঠ সংকটের সাথে রাসূল ﷺ-এর জীবনী মিলিয়ে নিতে পারে না।

অথচ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন খুব স্পষ্ট করে বলেন,

> 'আল্লাহর রাসূলের মাঝে তোমাদের জন্য আছে ভালো ভালো উদাহরণ'। (৩৩:২১)

কিন্তু দুঃখের ব্যাপার হচ্ছে, রাসূল ﷺ-এর সাথে মুসলিমদের সম্পর্ক যতটা কাছের হওয়া উচিত, ততটা হয় না।

শিশুরা কখনো কল্পনাও করতে পারে না তাদের প্রিয় রাসূল ﷺ একসময় তাদের মতোই শিশু ছিলেন। তিনি খেলেছেন, দৌড়াদৌড়ি করেছেন। টিনএজাররা কখনো ভাবেই না যে, তারা যেসব চ্যালেঞ্জের মুখোমুখী হয়ে দিন পার করছে, রাসূল ﷺ-কে ঠিক এমনই কিছু চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে হয়েছে। আমাদের তরুণরা জানে না কিভাবে তিনি পরিবর্তনের সাথে খাপ খেয়ে নিয়েছেন, কিভাবে তিনি অচলাবস্থার

নিরসন করেছেন। এই বইয়ে শিশু মুহাম্মাদ ﷺ, কৈশোরের মুহাম্মাদ ﷺ এবং নবুয়তের আগের যুবক মুহাম্মাদ ﷺ-কে দেখবেন ইনশাআল্লাহ।

নিঃসন্দেহে তিনি আমাদের ভালোবাসা আর শ্রদ্ধার পাত্র। আমরা প্রিয় নেতাকে জীবনের চেয়েও ভালোবাসি। কিন্তু আমরা তাঁকে এমন সম্ভ্রমজাগানিয়া নিখুঁত মানুষ হিসেবে তুলে ধরি যে, আমাদের সময়ে তাঁকে অনুসরণ করা বেশ কঠিন হয়ে পড়ে। আমরা কেন যেন রাসূল ﷺ-কে কঠিন করে উপস্থাপন করতে চাই।

এই বইতে পাঠক তাঁর সম্পর্কে এক নতুন চিত্র পাবেন। তারা দেখবেন কিভাবে তিনি আমাদের মতোই, আমরা যেসব চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছি, সেগুলোর মোকাবিলা করেছেন। সেগুলোর মোকাবিলায় তিনি আমাদের অনুপ্রাণিত করবেন।

পাঠক আরও খেয়াল করবেন যে, এখানে নিজের জীবন উন্নয়নের ধাপগুলোর বাস্তব চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। চিরাচরিত বইগুলোর বর্ণনাভঙ্গীতে অনেক সময় মনে হয়, আমরা কী আর তাঁর মতো হতে পারব? এ ধরনের হীনমন্যতা দূর করে বাস্তব পদক্ষেপ দেখিয়ে দেওয়াই মূল উদ্দেশ্য।

পৃথিবীতে মানুষ যতটা নিখুঁত হতে পারে নিঃসন্দেহে রাসূল ﷺ তা-ই ছিলেন। কিন্তু এটা সত্য যে, তিনি ছিলেন মানুষ। মানুষ হিসেবে অনেক সংকট ও চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছেন। এসব ইস্যুতে প্রিয় নবীজী আর আমাদের মাঝে দারুণ কিছু মিল আছে। আমরা সহজাত উপায়েই নবীজীকে অনুসরণ করতে পারি।

তাঁর ব্যাপারে আমি যেসব কাহিনি উল্লেখ করেছি, সেগুলো অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ও প্রমাণিত দলিল থেকে নিয়েছি। অন্যান্য কিছু বইয়েরও সাহায্য নিয়েছি। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো–

- আকরাম উমারী। আস-সীরাহ আন-নাবাউইয়াহ আস-সাহীহাহ (নবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর নির্ভরযোগ্য জীবনী), ২য় খণ্ড।
- মাহদি রিযকুল্লাহ আহমাদ, আস-সীরাহ আন-নাবাউইয়া ফি দাও'উল-মাসাদির আল-আসলিয়াহ (আদি উৎসের আলোকে ইসলামের নবীর জীবনী), ২য় খণ্ড।

আত্ম-উন্নয়নমূলক বিভিন্ন বইয়ের অনেক বিষয় আমি এখানে নিয়ে এসেছি। বিশেষ করে যেগুলো ইসলামের সাথে খাপ খায়, যেগুলো রাসূল ﷺ-এর জীবনে পাওয়া যায়। এগুলোর মধ্যে আছে সামাজিক বিচারবুদ্ধি, সৃষ্টিশীলতা, পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়া, নেতৃত্ব বিকাশের মতো বিষয়গুলো।

সূচীপত্র

মুহাম্মাদ ﷺ-এর শিশুকাল ১৭

মানসিক বিকাশ ১৭

ছয় বছরের নিচে বাচ্চারা ১৮

ভালোবাসার চাহিদা পূরণ ১৯

সন্তানের ওপর ভালোবাসার প্রভাব ২০

কীভাবে শিশুর মানসিক চাহিদা পূরণ করবেন? ২০

সন্তানের জন্য বাঁচা ২১

কীভাবে নিজের সন্তানকে অগ্রাধিকার দেবেন? ২১

বাচ্চার সাথে সময় কাটানোর মানে কী? ২২

মরু শিক্ষা ২২

মরুজীবন ২৩

মরুভূমি থেকে নিয়ে আসা মূল্যবোধ ২৪

আত্মশৃঙ্খলার মূল্য ২৫

বাচ্চাকাচ্চাদের শৃঙ্খলা শেখাবেন কীভাবে? ২৬

সামাজিক দক্ষতা শেখা ২৬

খেলাধুলার গুরুত্ব ২৭

ভাষা দক্ষতা ২৮

শিশুর ভাষাদক্ষতা কীভাবে বাড়াবেন? ২৯

মা'র মৃত্যু ২৯

কীভাবে মোকাবিলা করবেন? ৩০

মা হারানো পর ৩০

অপূর্ব বালক ৩১

বাচ্চাকাচ্চাদের আত্মবিশ্বাস কীভাবে বাড়াবেন? ৩২

নবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর শৈশব থেকে পাওয়া শিক্ষা ৩৩

রাসূল ﷺ-এর পরিবার **৩৪**
বৈচিত্র্যময় অভিজ্ঞতা ৩৪
বর্ধিত পরিবার ৩৫
রাসূল ﷺ-এর পরিবার ৩৬
কুসাই ৩৭
আবদু মানাফ ৩৭
হাশিম ৩৭
আবদুল মুত্তালিব ৩৭
যমযম আবিষ্কার ৪০
হস্তীবর্ষ ৪১
শেষ বিন্দু দিয়ে লড়াই করুন ৪৩
রাসূল ﷺ-এর পরিবারের নারী সদস্যা ৪৪
রাসূল ﷺ-এর মা-বাবা ৪৪
আমিনা ৪৪
আবদুল্লাহ ৪৫
পরিবারের সুব্যবহার ৪৬
সন্তানকে বর্ধিত পরিবারের সাথে জুড়বেন কীভাবে? ৪৭
বর্ধিত পরিবারের বিকল্প ৪৭
রাসূল ﷺ-এর পরিবারের সদস্যগণদের থেকে শিক্ষা ৪৮

রাসূল ﷺ-এর চারপাশ **৪৯**
আপনার প্রভাব-বলয় বাড়ান ৪৯
নিজের পরিবেশকে ছাঁচ দেওয়া ৫০
মক্কা ৫১
সমাজ ৫২
নারী ৫৪
বিদেশিরা ৫৫
অর্থনীতি ৫৭

বাজার ৫৮
সুক উকাজ ৫৮
বাজারে রাসূল ﷺ ৫৯
প্রভাব বলয় ৬১
মূর্তিপূজা ৬১
আল্লাহর উপাসনাকারীরা ৬২
নিজের পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ ৬৩
প্রকৃতি বনাম পরিচর্যা ৬৩
রাসূল ﷺ-এর পরিবেশ থেকে আমাদের কী লাভ ৬৪

মুহাম্মাদ ﷺ-এর কৈশোর ৬৫

আস্থাভাজন হোন ৬৫
টিনএজ ৬৬
ঘরে ভালোবাসা ও সম্মান ৬৭
কিশোরদের সমর্থন দরকার ৬৯
আপনি কীভাবে টিনএজদের ভালোবাসবেন? ৬৯
সম্মান ৬৯
কিশোর রাসূল ﷺ-এর সাথে আবু তালিব ৭১
আপনার টিনএজের সাথে আপনার ব্যবহার ৭১
টিনএজ বয়সীদের কীভাবে সম্মান দেখাবেন ৭১
ঘরের বাইরে ৭২
পিয়ার প্রেশার ৭৩
বিবেক ৭৪
উদাহরণ দিয়ে প্যারেন্টিং ৭৫
কীভাবে টিনএজদের বিবেক গড়ে তুলবেন ৭৫
বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ ৭৫
কাজ ৭৭
সফর ৭৯
রাসূল ﷺ-এর কিশোর বয়স থেকে ফায়দা ৮১

তরুণ মুহাম্মাদ ﷺ ৮২
সৃষ্টিশীল হোন ৮২
বাস্তব মডেল ৮৩
রাসূল ﷺ দেখতে কেমন ছিলেন? ৮৫
রাসূল ﷺ-এর ব্যক্তিত্ব ৮৬
সৃজনশীলতা ৮৭
কীভাবে সৃজনশীল হবেন? ৮৮
সংঘাত নিরসন ৮৯
কীভাবে সংঘাত নিরসন করবেন? ৮৯
কাজ ৮৯
নিজের সমাজের সাথে মিশুন ৯০
বন্ধুবান্ধব ৯১
বন্ধু নির্বাচনের সময় যা খেয়াল রাখবেন ৯১
বিয়ে ও পরিবার ৯২
বিশ্বাস ও মূল্যবোধ ৯৫
ধর্মচর্চা ৯৫
চিন্তাভাবন ও ব্যস্ত জীবন ৯৬
নিজের জন্য সময় ৯৬
যুবক-তরুণ বয়সে রাসূল ﷺ-এর জীবন থেকে শিক্ষা ৯৮

চল্লিশের কোঠায় রাসূল ﷺ ৯৯
পরিবর্তনের সাথে মানিয়ে নেওয়া ৯৯
৪০ বছরে পরিবর্তন ১০১
আমর আস সুলামী (রা) ১০৩
আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) ১০৪
মানুষ কীভাবে বদলায়? ১০৫
পরিবর্তনের সাথে মানিয়ে নেওয়া ১০৬

কুরআনে পরিবর্তন	১০৮
মক্কার সংখ্যাগরিষ্ঠরা এই পরিবর্তনকে কীভাবে দেখেছে?	১০৯
মক্কাবাসী যেভাবে পরিবর্তনে বাধা দিয়েছে	১০৯
প্রশিক্ষণের গুরুত্ব	১১০
নিরাপদ পরিবেশ	১১১
নিজের পরিস্থিতি বদলান	১১১
ইথিয়োপিয়া	১১২
দৃষ্টিভঙ্গি বদলান	১১৩
রাসূল ﷺ-এর জীবনের মূল ঘটনা	১১৩
দ্বন্দ্ব	১১৩
যোগাযোগের মাধ্যমে বদল	১১৪
পরিবর্তনের উপকরণ	১১৪
হিজরত	১১৫
নবিজির চল্লিশের কোঠার জীবন থেকে আমরা কী শিখতে পারি?	১১৬

পঞ্চাশের কোঠায় রাসূল ﷺ ১১৭

নেতৃত্ব গুণ	১১৭
মদিনা	১১৮
যোগ্য নেতৃত্ব	১১৯
বাস্তব নেতৃত্বের ভিত্তি	১২০
মদিনাবাসী	১২১
সম্পর্ক বদল	১২১
পরিবর্তনের পথে	১২২
কীভাবে পরিবর্তনে সামনে থেকে নেতৃত্ব দেবেন?	১২২
নেতৃত্বের চ্যালেঞ্জ	১২৩
বাগাড়া-বাধানো দল	১২৪
ভিন্নমতাবলম্বী লোকজন	১২৪
দ্বন্দ্ব নিরসন	১২৫

বদরের যুদ্ধ ১২৫
উহুদ পাহাড় ১২৬
নেতৃত্ব শিক্ষা (এক) ১২৭
পরিখার যুদ্ধ ১২৮
নেতৃত্ব শিক্ষা (দুই) ১২৯
অবরোধ ১৩০
শান্তি ১৩০
কীভাবে অন্যদের রাজি করাবেন? ১৩১
অচলাবস্থা নিরসন ১৩২
প্রতিপক্ষকে কীভাবে বুঝাবেন? ১৩৩
মক্কায় প্রবেশ ১৩৩
নিজের প্রভাব বাড়ান ১৩৩
নবি ﷺ জীবনের শেষ ১৩৪
রাসূল ﷺ-এর নেতৃত্বগুণ থেকে ফায়দা ১৩৫
রাসূল ﷺ-এর মৃত্যু ১৩৬

পঞ্চাশের কোঠায় রাসূল ﷺ ১৩৭
প্রান্তটীকা....................১৩৯
বিবলিওগ্রাফি....................১৪১

মুহাম্মাদ ﷺ-এর শিশুকাল

সাধারণত বাচ্চাদের ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে প্রথম ছয় মাসে। এ সময়টাতে তাদের যথেষ্ট ভালোবাসা আর মনোযোগ প্রয়োজন। 'কোয়ালিটি টাইম' বা মানসম্পন্ন সময় বলে আমরা একটা বিষয় জানি। আমাদের ব্যস্ত জীবন আর ক্রমাগত সব মনোযোগ বিঘ্ন করা বিষয়ের মাঝে শিশুদেরকে আরও বেশি সময় দিতে হবে। যত্ন নিতে হবে। বিধবা মা আমিনার আলিঙ্গন, চুমু আর মায়াভরা হাসির মধ্য দিয়ে শিশু মুহাম্মাদ ﷺ-এর আবেগি প্রয়োজনগুলো পূরণ হয়েছে। শিশুদের জন্য এমন আনন্দ-উত্তেজনাময় পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে, যাতে তারা জীবনের জরুরি দক্ষতা অর্জন করতে পারে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ক্ষেত্রে সেটা ছিল মরুপ্রান্তর। আমাদের জন্য তা হতে পারে স্কুল, দিবা সেবাকেন্দ্র, রিডিং ক্লাব, আত্মীয়স্বজনের বাসা বা শিশুকেন্দ্রিক ফিটনেস সেন্টার।

মানসিক বিকাশ

ছয় বছর বয়স পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর মায়ের সঙ্গে ছিলেন। মা মারা যাওয়ার পর প্রথমে দাদা আবদুল মুত্তালিব এবং পরে চাচা আবু তালিবের সাথে থাকেন। একটি শিশুর বেড়ে ওঠার জন্য যে ধরনের আদর, ভালোবাসা ও যত্ন দরকার ছিল, তার সবই তিনি তাঁদের কাছে

পেয়েছিলেন। অন্যদিকে মরুভূমির কঠিন পরিবেশ তাঁকে দিয়েছে জীবনমুখী নানা দক্ষতা অর্জনের উৎসাহ।

শিশুর ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে প্রথম ছয় বছরে। প্রথম বছরে শিশুর মধ্যে অনুভূতি জন্মলাভ করে। দ্বিতীয় বছর থেকে তার শব্দভাণ্ডার সমৃদ্ধ হতে থাকে। তৃতীয় বছরে বাচ্চারা অন্যের সাথে ভাববিনিময় করতে শেখে। চতুর্থ বছর থেকে ধীরে ধীরে তারা হয়ে ওঠে আত্ম-নির্ভরশীল। পঞ্চম আর ষষ্ঠ বছরে তারা নিজেদের চাওয়া-পাওয়াগুলো তুলে ধরতে শেখে। এসময় নিজেদের আবেগ-অনুভূতিগুলো আরও ভালোভাবে প্রকাশ করতে শেখে। শিশুদের এই ছয় বছরের ব্যাপারগুলো একটি চার্টে আমরা দেখব।

প্রথম বছর	অনুভূতি জন্মলাভ করে।
দ্বিতীয় বছর	শব্দভাণ্ডার সমৃদ্ধ হতে থাকে।
তৃতীয় বছর	অন্যের সাথে ভাববিনিময় করতে শেখে।
চতুর্থ বছর	আত্ম-নির্ভরশীল হওয়ার চেষ্টা করে।
পঞ্চম বছর	চাওয়া-পাওয়া তুলে ধরতে শেখে।
ষষ্ঠ বছর	চাওয়া-পাওয়া তুলে ধরতে শেখে।

এই অধ্যায়ে আমরা ছয় বছর বয়স পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বাল্যকালকে দেখব। তাঁকে বড় করতে যেয়ে তাঁর মা ও দুধ-মা কী বিশাল ভূমিকা রেখেছিলেন, তা দেখব। এরপর দেখব, তাঁর শিশুকালের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে আমরা কীভাবে শিশুদের বড় করতে পারি।

ছয় বছরের নিচে বাচ্চারা

পরিবেশ আর ব্যক্তিত্ব ভেদে শিশুদের বেড়ে ওঠার গতি কমবেশি হয়ে থাকে। সে হিসেবে বলতে গেলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর বয়সের তুলনায় একটু বেশিই বড় ছিলেন। তাঁর বয়স যখন দু'বছরের নিচে, তখন তাঁর এনার্জি দেখে অনেকেই অবাক হতেন। তারপরও শিশুদের মাঝে এমন কিছু ব্যাপার থাকে যা মোটামুটি সবার জন্য এক। ছয় বছর পর্যন্ত একজন শিশুর বেড়ে ওঠার ব্যাপারগুলো আমরা আরেকটি চার্টে দেখব।

ছয় মাস	শিশু তার মায়ের কণ্ঠ চিনতে পারে। পরিচিত চেহারা দেখে হেসে ওঠে।
নয় মাস	তাদের মধ্যে প্রথম কৌতূহলের ছাপ পাওয়া যায়। মাঝে মাঝে উদ্বেগও দেখা যায়।
এক বছর	চারপাশ ঘুরে ঘুরে দেখার ইচ্ছে জাগে। সাধারণ নির্দেশনাগুলো বুঝতে শেখে।
দুই বছর	প্রায় দু'শ শব্দের মতো শব্দভাণ্ডার জমা হয়।
তিন বছর	এটা কেন, ওটা কেন- এমন প্রশ্ন করতেই থাকে। অন্যদের সাথে খেলাধুলা ও সাহায্যের মনোভাব গড়ে ওঠে। অন্যকে খুশি করতে চায়।
চার বছর	কিছুটা আত্মনির্ভরশীল হয়ে ওঠে। মজা করে। এক থেকে বিশ গুণতে শেখে।
পাঁচ বছর	শব্দভাণ্ডার আরও সমৃদ্ধ হয়। সময়ের ব্যাপারে সজাগ হয়।
ষষ্ঠ বছর	কথাবার্তা বলায় আস্থাশীল হয় এবং কৌতূহল আরও বৃদ্ধি পায়।

শিশুরা সাধারণত প্রথম পর্যায়গুলো মায়ের সাথে বেশি কাটায়। অনুভূতি সংক্রান্ত চাহিদাগুলো তিনিই পূরণ করেন। আর পরবর্তী পর্যায়গুলো সামাজিক আর ভাষাগত দক্ষতা অর্জনে কেটে যায়। আমরা দেখি যে, আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর জীবনেও এমনটা হয়েছে। অন্য আর দশটা শিশুর মতো তাঁর ঐ সময়টাও কেটেছে একান্তে মায়ের সাথে।

ভালোবাসার চাহিদা পূরণ

বাবা মারা যাওয়ার পর পরিবারের আর্থিক দায়দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেন দাদা আবদুল মুত্তালিব। সংসার খরচের চিন্তা না-থাকায় মা আমিনা তার পুরো সময়টা ছেলের পেছনে দিতে পেরেছিলেন। চাচা হিসেবে বাবা না থাকার কষ্ট কিছুটা হলেও পুষিয়ে দিতে পেরেছিলেন। কখনো আদরঘন আলিঙ্গন, কখনো মমতামাখা চুমু, কখনো-বা শিশু মুহাম্মাদ ﷺ-এর দিকে তাকিয়ে ভালোবাসার হাসি, এভাবেই তাঁকে আগলে রেখেছিলেন মা আমিনা। শিশুকালে রাসূল ﷺ তাঁর মায়ের সঙ্গে খুব বেশি একটা সময় কাটাতে পারেননি। অনেক শিশুরা এ বয়সে মায়ের সাথে অনেক সময় কাটায়। কিন্তু

তারপরও শিশু মুহাম্মাদ ﷺ যে ভালোবাসায় সিক্ত হয়েছিলেন, সেটা আজকাল অনেক শিশুর ভাগ্যেই জোটে না।

আজকালকার মা'রা অনেক বেশি ব্যস্ত। অনেক দায়িত্ব; ঘর সামলানো, চাকরি, স্বামীসেবা, অন্যান্য বাচ্চাদের দেখভাল ইত্যাদি। মা আমিনার কাঁধে এত বোঝা ছিল না। সংসার খরচের দায়ভার নিয়েছিলেন দাদা। কুঁড়ি বছর বয়সেই বিধবা আমিনাকে এসব নিয়ে কোনো দুশ্চিন্তা করতে হয়নি। মুহাম্মাদ ﷺ যে তাঁর একমাত্র সন্তান ছিল, এটাও বেশ কাজে এসেছে।

তখনকার সমাজে সন্তানের বেড়ে ওঠায় বাবারাই মূল ভূমিকা পালন করতেন। কিন্তু পরিস্থিতির দাবি মেনে মা আমিনা তাঁর মাতৃসুলভ ভালোবাসা আর আদরের পুরোটাই একমাত্র সন্তান মুহাম্মাদ ﷺ-এর ওপর ঢেলে দিয়েছিলেন।

সন্তানের ওপর ভালোবাসার প্রভাব

শিশুর মানসিক বিকাশে ভালোবাসা আর আদরের প্রভাব অনেক। এতে তার নিজের ব্যাপারে আস্থা জাগে, আত্মবিশ্বাস জন্মে। আবেগ-অনুভূতি গড়ে ওঠে। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যায়, এতে করে শিশুরা নিজেদের নিরাপদ মনে করে। পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার ক্ষমতা বাড়ে। আপনিও আপনার বাচ্চাকে জড়িয়ে ধরুন। ঘুম থেকে ওঠার পর কিংবা বাইরে থেকে বাসায় এসে তাকে সালাম দিন। চুমু দিন। তার সাথে খেলুন। এগুলো ওর মানসিক স্বাস্থ্য ভালো রাখবে। আত্মমর্যাদা বাড়াবে।

আপনার অবস্থা হয়ত এমন না যে, আপনি পারফেক্ট বাবা-মা হবেন। কিন্তু যতটুকু পারুন ওকে সময় দিন, আদর করুন। মনোযোগ দিন। মাঝেমধ্যে বা কেবল বিশেষ কোনো ঘটনায় ওর প্রতি আদর না-দেখিয়ে নিয়মিত দেখান।

কীভাবে শিশুর মানসিক চাহিদা পূরণ করবেন?

- প্রতিদিন চুমু দিন, জড়িয়ে ধরুন।
- ওর কথা মন দিয়ে শুনুন। বাধা দেবেন না।
- বাসার বাইরে থাকলে ফোন দিয়ে কথা বলুন।
- ওর সাথে খেলুন। নিজের পোশাক ময়লা হওয়া নিয়ে চিন্তার দরকার নেই।
- ভালোবাসা দিয়ে দিন শুরু করুন। আর অখুশি হয়ে কখনো দিন শেষ করবেন না।[১]

সন্তানের জন্য বাঁচা

মা আমিনার স্বামী মারা যান ৫৭১ সালে। তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র বিশ। তারপরও তিনি কিন্তু আর বিয়ে করেননি। তখনকার সমাজ অবশ্য বিধবাদের খাটো চোখে দেখত না। যাদের বংশ ভালো ছিল, তাদেরকে উঁচু নজরে দেখত। আমিনার রূপ আর কবিতা আবৃত্তির গুণে চাইলেই তিনি আবার বিয়ের পিঁড়িতে বসতে পারতেন। সমাজ যে তাঁকে এ ব্যাপারে পীড়াপীড়ি করেনি, তা কী করে বলি? কিন্তু তিনি বিধবাই থেকে গেলেন। সেই সমাজে বড় পরিবারের আলাদা মর্যাদা ছিল। আমিনার মনেও হয়ত অমন বড় পরিবারের স্বপ্ন ছিল। কিন্তু তিনি তাঁর ছেলে মুহাম্মাদের জন্য নিজেকে কোরবান করেছিলেন। শিশু মুহাম্মাদের জীবনকে ফুলে-ফলে সুশোভিত করতে নিজের জীবনের সাথে আপোষ করেছিলেন। তাঁর এই সিদ্ধান্ত মোটেও স্বাভাবিক ছিল না। ছিল প্রথাবিরোধী। বিশ বছর বয়সী এক বিধবা তরুণীর জন্য এই সিদ্ধান্ত যে অনেক কষ্টের ছিল, তা বলাই বাহুল্য।

কীভাবে নিজের সন্তানকে অগ্রাধিকার দেবেন?

শিক্ষাবিদরা শিশুদের জন্য আলাদা সময় রাখার গুরুত্বের কথা বলেন। যেন মনে হয়, শিশুদের সাথে সময় কাটানো একটা বোঝা। আনন্দের কিছু না। চাকরিজীবী মায়েরা তাদের সন্তানদের যথেষ্ট সময় দিতে পারেন না। এতে অনেক মা-ই মনে মনে এক ধরনের অপরাধবোধে ভোগেন। তাদের এই অপরাধবোধে প্রলেপ দেওয়ার জন্য 'আলাদা সময়' ধারণার জন্ম হয়। অথচ আলাদা সময়ের বদলে আমাদের তো শিশুদের সাথে এমনিতেই সময় কাটানোর কথা। আর সেটাও স্বতস্ফূর্তভাবে। ঘড়ি ধরে কেন? কত সুন্দরভাবে সময় কাটাচ্ছি বিবেচনার সাথে সাথে কতক্ষণ সময় কাটাচ্ছি, সেটাও কম গুরুত্বপূর্ণ না। বাবা-মা'রা সন্তানের সাথে যত বেশি সময় কাটাবে (এখানে 'বেশি' বলতে পরিমাণের কথা বলছি) তাদের সামাজিক, মানসিক ও অ্যাকাডেমিক সমস্যা তত কম হবে। মাদকে জড়ানোর আশঙ্কা কমবে। বখাটেগিরি বা এ ধরনের কোনো অপরাধমূলক কাজ অথবা বিয়ের আগে বিপরীত লিঙ্গের কারও সাথে হারাম সম্পর্কে জড়ানোর প্রবণতা কমবে। লরা রামিরেজের কথায় এমনটাই পাওয়া যায়-

'বাচ্চাদের পার্কে নিয়ে যান। এটা ভালো। কিন্তু এটা কোনোভাবেই ভালো প্যারেন্টিঙের বিকল্প না। বাবা-মা'কে তাদের বাচ্চার ছায়া হয়ে থাকতে হবে। এর মানে তাদের সাথে ভালো সময় কাটাতে হবে। ওদের সময়টা যখন ভালো যাবে না, তখন ওদের পাশে থাকতে হবে। ওদের প্রতিটা সমস্যায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে হবে'।[২]

বাচ্চার সাথে সময় কাটানোর মানে কী?

- সময় কাটানো মানে এই না যে, সবসময় কিছু না কিছু করতেই হবে। ওদের সাথে থেকে ওরা কী করছে, না করছে তার ওপর নজর রাখাই যথেষ্ট।
- ওকে সময় দেওয়া সংসারের দৈনন্দিন টুকিটাকি কাজের অংশ নয়। কাজেই ওকে এমনভাবে সময় দেবেন না, যাতে ওর মনে এই ধারণা উঁকি দেয়।
- যেকোনো সময় আপনার কাছে ঘেঁষতে ওর মনে যেন কোনো ধরনের সংকোচ কাজ না করে।

মরু শিক্ষা

রাসূল ﷺ ছোটবেলায় শুধু মা'র কাছ থেকেই শেখেননি। তাঁর দুধ-মা হালিমা এবং তাঁর পরিবার থেকেও মানসিক বিকাশের শিক্ষা নিয়েছেন। হালিমার আরও তিন সন্তান ছিল- আবদুল্লাহ, আনিসা, শায়মা। সাথে ছিল তার স্বামী আল হারিস। মক্কা থেকে তাদের বাড়ির দূরত্ব ছিল ১৫০ কিলোমিটার। মাঝে মাঝেই এখান থেকে মক্কায় যাওয়া হতো তাঁর। প্রায় চার বছর তিনি এখানে কাটিয়েছেন। অনেক কিছু শিখেছেন এখান থেকে।

সে সময়কার আরব উপদ্বীপের মরুভূমি অঞ্চল সম্পর্কে জানলে সহজে বুঝতে পারব রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বাল্যকালে মরুভূমির ভূমিকা কেমন ছিল। কী কী মূল্যবোধ তিনি এখান থেকে শিখেছেন।

তখন স্কুল-কলেজ বলতে তেমন কিছুই ছিল না। মরুভূমির এক একটা পরিবারই ছিল এক ধরনের স্কুল। শহরের বাবা-মা'রা বাচ্চাদের চারিত্রিক বিকাশের জন্য, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর জন্যই মরুর এসব পরিবারে পাঠাতেন।

মূলত, গ্রামাঞ্চল ও মরুভূমির চেয়ে শহর অঞ্চলে অসুখ-বিসুখের মাত্রা ছিল তুলনামূলক বেশি। শহরের জনসংখ্যা ছিল প্রায় বিশ হাজার। ইসলামের বার্তা পুনরায় চালু হওয়ার আগে থেকেই সেখানে হজ্জের রীতি বহাল ছিল। হজ্জের সময়ে স্বাভাবিক কারণে লোকজনের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পেত। যার কারণে নানারকম রোগ বালাই এর আশঙ্কাও বৃদ্ধি পেত। এসব কারণে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য সেসময় অধিকাংশ শহুরে পরিবারের বাচ্চাদের মরু অঞ্চলে পাঠানো হতো। তাছাড়াও মরু অঞ্চলের কথ্য আরবি যেকোনো ধরনের বিকৃতি থেকে মুক্ত ছিল। মরুভূমির বেশিরভাগ নারীই পেশা হিসেবে বা পারিবারিক বন্ধন গড়ার খাতিরে শহরের বাচ্চাদের লালনপালনের জন্য নিয়ে যেতো। নতুন আর অজানাকে জানার, আবিষ্কারের পসরায় সজ্জিত ছিল মরুভূমির উন্মুক্ত বালুচর। শহরের দালানঘরে সেই সুযোগ কোথায়?

মরুভূমিতে থেকে থেকে শিশু মুহাম্মাদের সামাজিক আর যোগাযোগের দক্ষতা বেড়েছে। শারীরিক সামর্থ্য বেড়েছে। ভাষা শাণিত হয়েছে। সে সময়ের মরু-অঞ্চল, বাচ্চাদের এসব দিকগুলো বিকাশের জন্য দারুন সহায়ক ছিল।

তবে আজকের জমানায় এসে আমি আপনার শিশুকে মরুভূমিতে পাঠাতে বলব না। কিন্তু যেসব পরিবেশ শিশুদেরকে উদ্দীপ্ত করবে, সেগুলোকে কখনোই উপেক্ষা করবেন না। এগুলো হতে পারে স্কুল, দিবাসেবা, আত্মীয়ের বাসা কিংবা এধরনের অন্য কিছু। খেয়াল রাখতে হবে, এই জায়গাগুলো যেন নিরাপদ হয় এবং শিশুর প্রতিভা বিকাশ ও আবিষ্কারে সহায়ক হয়।

মরুজীবন

মরুজীবনের বাস্তবতা বুঝার দুটো উদ্দেশ্য রয়েছে। যথা-

- মুহাম্মাদ ﷺ-এর জীবনে মরু জীবন কী ধরনের প্রভাব ফেলেছিল।
- তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে আমরা কী শিখতে পারি।

মরুবাসীদের জীবন ছিল যেনতেন উপায়ে বেঁচে থাকা। টিকে থাকাটাই মূখ্য। বিলাসিতার কোনো জায়গা নেই সেখানে। শুষ্ক এই আবহাওয়ার তীব্র দাবদাহে সূর্যের নিচে ডিম ভাজি হয়ে যেত। পানি আর ছায়া দুটোরই অভাব ছিল।

আজকাল আমরা পিপাসা মেটানোর জন্য যে পরিমাণ পানি খাই, তখন তারা এত খাওয়ার সুযোগ পেত না। সামান্য পানি খেয়ে বেঁচে থাকার জন্য শুধু গলা ভেজাতেন। যেহেতু পানি কম ছিল, খাবারের উৎসও কম ছিল। মরুদ্যান, কুয়ো বা ঝরনার আশপাশ ছাড়া ফসলের ক্ষেত খুব একটা হতো না।

খাওয়ার কষ্ট, পানির কষ্ট নিয়েই বেদুইনরা বাঁচতে শিখেছে। 'আরও খাবো, আরও খাবো'! এ রকমটা বলে অভিযোগ করতেন না। খাওয়াদাওয়া বা ভোগ করা তখন আনন্দের জন্য ছিল না। ছিল টিকে থাকার জন্য। জীবনের এই কঠিনতা তাদেরকে জীবনের দুঃখকষ্টগুলোকে বিনা অভিযোগে বরণ করতে শিখিয়েছিল।

আল্লাহর রাসূল ﷺ এ ধরনের পরিবেশে বেড়ে উঠেছিলেন। তাঁর ওপর এই পরিবেশের যথেষ্ট প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পরও তিনি কখনো পেট পুরে খাননি। ক্ষুধার যন্ত্রণা দমন করার জন্য পেটে চ্যাপ্টা পাথর বাঁধতেন। এমন কত দিন গেছে তাঁর ঘরে চুলো জ্বলেনি। খুব কম সময়েই তিনি মাংস খেয়েছেন; বরং বেশিরভাগ সময়েই খসখসে রুটি খেতে হয়েছে। খাবার না থাকলে সিয়াম পালন করতেন। তালগাছের পাতা দিয়ে বানানো মাদুরে ঘুমোতেন।

বর্তমান দুনিয়ার চোখে দেখলে তাঁর জীবনযাপন পদ্ধতি অদ্ভুত মনে হতে পারে। কিন্তু আসলে তিনি বাচ্চা বয়সেই এমনটা শিখেছেন। সেটা ইচ্ছাকৃতভাবে ধরে রেখেছেন। এমনকি মক্কায় আসার পরও। মরুভূমিতে তিনি যেসব দামি মূল্যবোধ অর্জন করেছিলেন, তাঁর নিজ পরিবেশ সেগুলোকে আরও জোরদার করেছে।

মরুভূমি থেকে নিয়ে আসা মূল্যবোধ

রাসূল ﷺ মরুজীবন থেকে যে শিক্ষা নিয়ে এসেছিলেন, তাঁর মা সেটার মূল্য বুঝেছিলেন। স্কুলে যদি ভালো কিছু শেখায়, তাহলে বাবা-মা'দের এর বিরোধী কিছু শেখানো ঠিক হবে না। শিশুকে বরং এমন পরিবেশ দিতে হবে, যেটা তার স্কুলের শিক্ষাকে আরও পোক্ত করবে। মরুস্কুলে রাসূল ﷺ সহ্য করার ক্ষমতা আর আত্ম-নিয়ন্ত্রণের যে শিক্ষা নিয়েছিলেন, মা আমিনা তার ঘরে সেই একই শিক্ষা জারি রেখেছিলেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ মরু শিক্ষার বাস্তবতা পরিবারে এসেও পেয়েছিলেন। পারিবারিকভাবেই তাঁর জীবন ছিল সাদাসিধা, অনাড়ম্বর। তাঁর মা শুকনো মাংস খেতেন। দাদা দানের টাকা জোগাড় করে হজ্জ পালনকারীদের পানির ব্যবস্থা করতেন। চাচা যৌথ পরিবারের খরচ জোগাতেন। ব্যবস্থাপনার প্রশিক্ষণ পরিবারেই পেয়েছিলেন।

বাচ্চাকাচ্চারা স্কুলে যা শেখে, ঘরে এবং সাধারণভাবে সমাজে যদি সেই একই শিক্ষা জোরদার করে, তাহলে বাচ্চারা নিজেদের নিরাপদ ভাবে। আত্মবিশ্বাসী হয়।

আত্মশৃঙ্খলার মূল্য

শৃঙ্খলার মাধ্যমে শিশুরা নিজেদের নিয়ন্ত্রণ করতে শেখে। তাদের আচারআচরণ সন্তোষজনক হয়। ঠিক সিদ্ধান্ত নিতে শেখে। তবে এজন্য বাবা-মা'র তরফ থেকে এনার্জি ও কমিটমেন্টের দরকার হয়। বাবা-মা কতটা শক্তি ঢালবেন আর কতটা লেগে থাকবে তা নির্ভর করে বাচ্চার ব্যক্তিত্ব এবং কী রকম পরিবেশে সে বেড়ে উঠছে তার ওপর।

রাসূল ﷺ মরুভূমিতে শৃঙ্খলার পাঠ নিয়েছেন। নির্দিষ্ট সময়ে তাঁকে ঘুমোতে যেতে হয়েছে। উঠতে হয়েছে। বিভিন্ন কাজেকর্মে সহযোগিতা করতে হয়েছে। গবাদিপশুর দেখভাল করতে হয়েছে। একটু অন্যরকমভাবে মক্কায় নিজের বাড়িতে সেই একই শৃঙ্খলা জোরদার করা হয়েছে। বাচ্চার চারপাশ আর ব্যক্তিত্বের সঙ্গে খাপ খায় এমন শৃঙ্খলার মধ্যে বাচ্চাকে বেড়ে তোলা আজকের দিনের অন্যতম চ্যালেঞ্জ। মন যা-ই চাক, বাচ্চাকে দায়িত্ববানের মতো কাজ করতে হবে এটাই শৃঙ্খলা। কচি বয়সেই এটা গড়ে তুলতে হবে।

ষাটের দশকের শেষের দিকে বাচ্চাদের শৃঙ্খলা নিয়ে এক বিখ্যাত গবেষণা হয়। সেখান থেকে দেখা যায়, বাচ্চা বয়সে শেখা শৃঙ্খলা পরবর্তী বয়সে টেকসই হয়। স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ওয়াল্টার মিসচেল চার বছর বয়সী একদল বাচ্চাকে একটা করে মার্শম্যালো দেন। তাদেরকে দুটো অপশন দেন: 'হয় এখন খাও। নয় পরে খাও। তবে পরে খেলে আরেকটা মার্শম্যালো পাবে'। তো এই গবেষণায় দেখা যায়, যেসব শিশুরা তাদের খাওয়ার লোভ সংবরণ করতে পেরেছিল, পরিণত বয়সে তাদের মধ্যে শৃঙ্খলার ছাপ বেশি পাওয়া গিয়েছিল। জীবনে তাদের অর্জনও বেশি।

বাচ্চাকাচ্চাদের শৃঙ্খলা শেখাবেন কীভাবে?

মারধোর, গালি-বকা দিয়ে শৃঙ্খলা শেখানো যায় না। সদয় আচরণ আর সুন্দর লালনপালনের মাধ্যমে এটা সম্ভব। নিচে আমরা কিছু উপায় দিচ্ছি। চেষ্টা করে দেখুন-

- ভালো কাজের প্রশংসা করুন। এটা তার মধ্যে আত্মবিশ্বাস বাড়াবে। আর আপনাকে খুশি করার জন্য এমন কাজ বার বার করতে চাইবে।
- এমনভাবে বলুন যেন সে বুঝে।
- 'করো না' কথাটা অতিরিক্ত ব্যবহার করবেন না। 'গলার আওয়াজ উঁচু করো না'। এমনটা না বলে বলুন, 'একটু আস্তে কথা বলো'।
- বকাঝকার মধ্যে না রেখে মজাদার বিকল্পের ব্যবস্থা করুন।
- ওদের সাথে কোনো কিছু নিয়ে আলাপ করতে গেলে এমন সময় করবেন না, যখন আপনি রেগে আছেন। ওর মন খারাপের সময়ও আলাপ করবেন না।

সামাজিক দক্ষতা শেখা

মরুভূমিতে থাকা অবস্থায় শিশু মুহাম্মাদ ﷺ বেশকিছু কাজ করতেন বলে ধারণা করতে পারি। এই যেমন- পানি আনা-নেওয়া, গবাদিপশুর দেখভাল, তাঁবু টাঙানো, খুলে ফেলা, বড়দের ও মেহমানদের সাহায্য করা। এগুলো তাঁর মধ্যে সহযোগিতা, ভাগাভাগি আর অন্যের দেখভালের মতো গুরুত্বপূর্ণ অভ্যাসগুলো গড়ে দিয়েছে।

শারীরিক সক্রিয়তার সাথে দক্ষ হওয়ার সরাসরি সম্পর্ক আছে। যেসব শিশুরা শারীরিকভাবে বেশি সক্রিয়, তারা কম সক্রিয় শিশুদের তুলনায় সামাজিক দায়িত্ব ও নেতৃত্বস্থানীয় ভূমিকা পালনে বেশি অগ্রণী হয়। তবে খেয়াল রাখতে হবে শিশুকে এজন্য যেন চাপাচাপি করা না-হয়। আর সক্রিয় হওয়ার জন্য ওর পরিবেশ নিরাপদ ও আরামদায়ক রাখতে হবে।

মরুভূমিতে দৌড়াদৌড়ি ও খেলাধুলা করার জন্য শিশু মুহাম্মাদ ﷺ-এর সামনে ছিল প্রশস্ত মরুপ্রান্তর। শিশুসুলভ বিভিন্ন কাজকর্মের মধ্য দিয়েই তিনি একে অন্যকে সহযোগিতা করতে শিখেছেন। অন্যের সাথে ভাগাভাগি ও দেখভাল করতে শিখেছেন।

শিশুরা যখন খুশিতে থাকে, আনন্দে থাকে, তখন তারা ভালো শেখে। মজাদার সময়গুলো শিশুদের বেড়ে ওঠার সেরা সময়। কারণ, তারা খেলতে পছন্দ করে। চমক পছন্দ করে। কোনো কোনো বাবা-মা মনে করেন শিশুদের খেলাধুলা মানে সময় নষ্ট। এমন ধারণা মোটেই ঠিক না।

বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যায়, ওরা যখন খেলার মধ্যে থাকে, তখনই ওরা সহজে শেখে। গুরুত্বপূর্ণ দক্ষতা অর্জন করে।[৩]

গৎবাঁধা স্কুলগুলোতে কচি শিশুদের আদেশ-নিষেধের বেড়াজালে বন্দি করে ফেলা হয়। খালি পড় আর পড়। অন্যদিকে উন্নতমানের স্কুলগুলোতে বিভিন্ন দক্ষতা আর আচরণ শেখানোর জন্য মজাদার কাজকারবার করা হয়।

খেলাধুলার গুরুত্ব

ছোট বয়সে তাদের খেলার সময়সীমা কেটে দিবেন না। এমন ভাবার দরকার নেই যে, তারা বড় হয়ে গেছে, এখন আর বেশি খেলার দরকার নাই। আবার সে কোন ধরনের খেলা খেলবে, সেটাও চাপিয়ে দিতে যাবেন না। ওকে ওর মতো খেলতে দিন। মনের মতো।

শিশু মুহাম্মাদ ﷺ যখন অন্যান্য বাচ্চাদের সাথে খেলছিলেন, তখন বক্ষবিদারণের সেই বিখ্যাত অলৌকিক ঘটনা ঘটে। কাজেই খেলাধুলার সময়কে অবমূল্যায়ন করবেন না। শিশুদের বেড়ে ওঠা ও শেখার জন্য এটা পার্ফেক্ট অপরচুনিটি।

মরুভূমিতে থাকার সময়ে তিনি দায়িত্ব ও যোগাযোগ রক্ষার ব্যাপারগুলো শিখেছেন। ওখানকার আবহাওয়া অনেক গরম। জীবন ধারণও কঠিন। কিন্তু মক্কার ব্যস্ত গলির চেয়ে মরুরাস্তায় তিনি ছুটে বেড়াতে পেরেছেন। যাযাবরদের জীবন মানে প্রতিদিন নতুন গন্তব্য। তাঁবু গাড়া, গবাদিপশু দেখা, আশপাশ দিয়ে যাওয়া কাফেলাগুলোকে সাময়িক আশ্রয় দেওয়া আর নিরাপদ জায়গা খোঁজা।

নিঃসন্দেহে শিশু মুহাম্মাদ ﷺ-এর জন্য এ ধরনের পরিবেশ ছিল বেশ রোমাঞ্চকর। উত্তেজনাময়। এটা তার চরিত্র বিকাশের সুযোগ করে দিয়েছে। আমি আগেই বলেছি, আনন্দের মাঝে শিশুরা শেখে।

ভাষা দক্ষতা

মরুভূমির পরিবেশ তাঁর ভাষা দক্ষতা বাড়াতেও সাহায্য করেছে। স্কুলে ভর্তির আগের সময়টাতে শিশুদের মধ্যে এই দক্ষতা গড়ে ওঠে। মরুভূমির পরিবেশ বিজাতীয় সংস্কৃতি আর ভাষা বিকৃতি থেকে মুক্ত ছিল। যে কারণে রাসূল ﷺ হয়ে উঠেছিলেন বিশুদ্ধভাষী। অনেক শব্দ শিখেছেন সেখানে।

মক্কায় তাঁর পরিবারের চেয়ে এখানে সদস্য সংখ্যা পাঁচজন বেশি ছিল। তাছাড়া ওখানে কেবল হজ্জের মৌসুমে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে লোকজন আসত। এখানে প্রায়ই বিভিন্ন কাফেলা যেত। তাদের সংস্পর্শে তিনি বিভিন্ন আঞ্চলিক আরবির সান্নিধ্যে আসেন।

মক্কার লোকেরা তাদের শিশুদের যেসব কারণে মরুভূমিতে পাঠাতো, তার মধ্যে একটি ছিল তাদের আরবির ভিত যাতে মজবুত হয়। কমবেশি চার বছর শিশু মুহাম্মাদ ﷺ সেখানে কাটিয়েছেন। আমাদের সময়ে হিসেব করলে স্কুলে ভর্তি হওয়ার আগে যে সময়টা বাচ্চাকাচ্চারা বাবা-মা'র সাথে থেকে অনেক কিছু শেখার সাথে ভাষাটাও শেখে। তো ঐ বয়সে মরুভূমির অনুকূল পরিবেশ ভাষায় তাঁর শক্ত ভিত গড়ে দিয়েছিল।

অন্যান্য বিষয়ে পারদর্শিতার আগে বাচ্চাদের মধ্যে ভাষাপটুতা আগে তৈরি হয়। অনেক শিশু প্রথম বছরে বিভিন্ন শব্দ শেখে। দুই বছর থেকে চার বছরে শব্দভাণ্ডার সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ে। চার বছরের মধ্যে গড়পড়তা একটি শিশু হাজার খানেক শব্দ শেখে। এসব শব্দ ব্যবহার করেই তারা তাদের চাহিদা তুলে ধরে। কথা বলে। আত্মবিশ্বাস পায়।

আপনি খেয়াল করলে দেখবেন, যেসব শিশুরা ঠিকমতো কথা বলতে পারে না, তাদের মধ্যে এক ধরনের হতাশা কাজ করে। এতে করে তাদের মধ্যে অনাকাঙ্ক্ষিত কিছু আচরণ চোখে পড়ে। যেমন- উগ্র মেজাজ, অযথা চিৎকার-চেঁচামেচি।

শিশুর ভাষাদক্ষতা কীভাবে বাড়াবেন?

- পনের মিনিট করে ওকে গল্প পড়ে শোনান। বর্ণনামূলক গল্প শিশুর কল্পনাশক্তি ও শব্দভাণ্ডার বাড়ায়।
- ওর কথা মন দিয়ে শুনুন। এতে করে ওর কথা বলার নৈপুণ্য বাড়বে।
- ওর মধ্যেও মন দিয়ে কথা শোনার অভ্যাস গড়ে তুলুন। ভাষাদক্ষতা বাড়ানোর জন্য অন্যের কথা মন দিয়ে শোনা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। বড়দের জন্যও এটা খুব কাজের।

মা'র মৃত্যু

এ পর্বে আমরা কথা বলব রাসূল ﷺ এর মা'র মৃত্যু নিয়ে। এরপর সেখান থেকে তাঁর দাদার বাড়িতে লালনপালন। সেখানে কিন্তু তিনি চমৎকার আদরযত্নে লালিত হয়েছেন। প্রতিটি শিশুর শৈশব এমনই হওয়া উচিত আসলে।

মক্কায় ফিরে শিশু মুহাম্মাদ ﷺ দুবছর মায়ের সঙ্গে কাটান। মা আমিনা মারা যান ২৬ বছর বয়সে। তখন মুহাম্মাদ ﷺ-এর বয়স মাত্র ছয়। এত অল্প বয়সে যাদের মা মারা গেছেন, কেবল তারাই হয়ত তাঁর কষ্টটা বুঝতে পারবেন।

রোমান অর্থডক্স যাজক এবং ঔপন্যাসিক কন্সট্যান্টিন ঘিরঘিউ (Constantin Gheorghiu) তার লা ভিয়ে ডে মাহোমেত (La Vie De Mahomet) বইতে সেই করুণ দৃশ্যের কল্পনা করেছেন এভাবে-

> 'শিশু তার মায়ের কবরের পাশে বসে আর্তনাদ করছে, 'মা, তুমি বাসায় আসো না কেন? এই জীবনে তুমি ছাড়া আমার আর কে আছে'?[৫]

এই বর্ণনা ঐতিহাসিকভাবে নির্ভরযোগ্য না। তবে এমন করুণ অবস্থার মুখোমুখী যারা হননি, তারা হয়ত এ থেকে তাঁর কষ্টের কিছুটা আঁচ করতে পারবেন। বাবাকে তো তিনি কখনো দেখেনইনি। জন্মের আগেই তাঁর বাবা মারা গিয়েছিলেন। তিনি মা'র খুব আপন ছিলেন। তার সাথে জড়িয়ে আছে কত না-ভোলা স্মৃতি।

বাস্তবে বলুন তো কে চায় এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে? কেউ না। তবে শিশুর কাছের কেউ, আপন কেউ যদি মারা যায়, বা তার সাথে বিচ্ছেদ হয়, সেক্ষেত্রে এ ধরনের পরিস্থিতি মোকাবিলার উপায় জানা জরুরি।

কীভাবে মোকাবিলা করবেন?

- প্রথম দফাতেই তাকে মৃত্যুর খবরটা জানিয়ে দিন। কারণ ঘরের পরিবেশ দেখে এমনিতেই সে বিষয়টা আঁচ করবে। আর তাছাড়া তার জানার অধিকার তো আছেই।
- বলার সময় বাচ্চার বয়সটাও মাথায় রাখবেন। ২ থেকে ৫ বছরের শিশুরা মৃত্যুকে ঘুমের মতো মনে করে। তারা মনে করে মৃত মানুষ ঘুম থেকে আবার উঠবে। ৬ থেকে ৯ বছর বয়সী বাচ্চারা মৃত্যুর বিষয়টা বুঝবে। তবে আলাদা হয়ে যাওয়াটাকে তারা ভয় পায়।
- বাচ্চা যেন তার আবেগ-অনুভূতি প্রকাশ করতে পারে সেজন্য তাকে উৎসাহ দিন। তার প্রশ্নগুলোর ঠিকঠাক উত্তর দিন।
- তার মধ্যে যেন ভালোবাসা হারানোর ভয় না-ঢোকে। আর যা হয়েছে তার জন্য যে, সে কোনোভাবেই দায়ী না- এ ব্যাপারে তাকে আশ্বস্ত করুন। কারণ, অনেক শিশুকে দেখা যায়, আপন কারও মৃত্যুতে সে নিজে নিজেকে দোষী ভাবতে শুরু করে। এমনও মনে করে যে, সে-ই এজন্য দায়ী।

মা হারানো পর

মা'র মৃত্যুর পর দাদা আবদুল মুত্তালিব তার নাতির দায়িত্ব নেন। আবদুল মুত্তালিব কেমন মানুষ ছিলেন সে নিয়ে পরে এক অধ্যায়ে কথা বলব। এখানে আমরা নজর দেব নবির শৈশবে তাঁর দাদুর পরিবারের ওপর।

আচ্ছা কেউ কি বলতে পারেন রাসূল ﷺ-এর দাদির নাম কী? আমাদের সীরাহ বইগুলোতে দাদার ভূমিকা অনেক বেশি করে বলা থাকে। আসলে ঐ পরিবারের সব আয় উপার্জন তিনিই করতেন। তো সঙ্গত কারণেই তার কথা বেশি এসেছে। কিন্তু রাসূলের কিন্তু একজন দাদিও ছিল। তার নাম ফাতিমা আমর।

বালক মুহাম্মাদ ﷺ-কে ঐটুকু বয়সে মমতা দিয়ে তিনিই আগলে রেখেছিলেন। কেন রাখবেন না? তিনি তো শুধু আবদুল মুত্তালিবের স্ত্রী ছিলেন না। তিনি ছিলেন মা আমিনার শাশুড়ি। রাসূল ﷺ-এর বাবা আবদুল্লাহ তো তারই আদরের ছেলে ছিলেন।

ছয় বছর পর্যন্ত শিশু মুহাম্মাদ ﷺ-এর ছায়া হয়ে ছিলেন তাঁর মা আমিনা। মায়ের মৃত্যুর পর সে অভাব পূরণ করেন দাদি ফাতিমা। রাসূলের ছোট মেয়ের নাম তো সবাই কমবেশি জানি: ফাতিমা। রাসূল ﷺ কি তাঁর দাদির সম্মানে মেয়ের নাম ফাতিমা রেখেছিলেন? এটা হলফ করে বলা যায় না। তবে সেই সম্ভাবনা উড়িয়েও দেওয়া যায় না।

অপূর্ব বালক

বালক হিসেবে রাসূল ﷺ ছিলেন অসাধারণ। হাদীস থেকে দেখা যায়, তাঁর দাদা ছোটবেলাতেই এটা খেয়াল করেছিলেন। বলেছিলেন এই ছেলে বড় হয়ে বিশেষ কিছু হবে। প্রায় একই রকমের ভবিষ্যদ্বাণী আরও একজন করেছিলেন। ১২ বছর বয়সে কিশোর মুহাম্মাদ ﷺ যখন সিরিয়া সফরে যান, তখন এক সন্ন্যাসী এরকমটা বলেছিলেন।

বালক মুহাম্মাদ ﷺ যখন দাদার ঘরে লালিত হচ্ছেন, তখন দাদার বয়স আশির কোঠায়। খুব ভালোবাসতেন নাতিকে। তবে এই নাতি যে একসময় নবি হবেন এমন কথা তারা হয়ত কল্পনাতেও কোনোদিন ভাবেননি। তাঁর মাও কি কখনো এমন স্বপ্ন দেখেছিলেন? বড় হয়ে বিশেষ কিছু হবেন এ পর্যন্তই হয়ত।

তাঁকে নিয়ে তাদের উচ্ছ্বাস তাঁর কানেও পৌঁছাত। বার বার পৌঁছাত। তাঁকে নিয়ে তাদের ভাবনা তিনি হৃদয় দিয়ে অনুভব করতেন। যে বাচ্চা সবসময় বাবা-মা'র মুখে শোনে সে ভদ্র, স্মার্ট, বড় হয়ে ভালো কিছু হবে- সেই বাচ্চাকে দেখবেন; আর যে-বাচ্চা প্রতিনিয়ত বাবা-মা'র গালি আর বকা খায়, সে বাচ্চাকে দেখবেন। দুই বাচ্চার বেড়ে ওঠাতে বিস্তর পার্থক্য খুঁজে পাবেন।

বাবা-মা'র কাছ থেকেই কিন্তু শিশুরা নিজেদের ব্যাপারে জানতে শেখে। কারণ বাবা-মা তাকে সবচেয়ে ভালোভাবে চেনে। কাজেই তাদের কথা সে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে। সেখান থেকেই তার মধ্যে আত্মমর্যাদা গড়ে উঠে। তারা যা বলেন, সেগুলোর অনুরণন তার কানে বাজতে থাকে। কাজেই শিশুদের নিয়ে যা-ই বলবেন, ভেবেচিন্তে বলবেন!

বাচ্চাকাচ্চাদের আত্মবিশ্বাস কীভাবে বাড়াবেন?

- প্রতিটা শিশুর মধ্যেই প্রতিভা আছে। আপনার নিজের বাচ্চাটাও প্রতিভাবান। আপনি তার প্রতিভা আবিষ্কারে সাহায্য করুন। তার প্রতিভা বিকাশে সহায়তা করুন। সে যদি দেখে আপনি তার পাশে আছেন, তাকে সাহস যোগাচ্ছেন, তাহলে সে-ও নিজের সামর্থ্য নিয়ে বিশ্বাস করতে শিখবে।

- বলার সময় কী কী শব্দ ব্যবহার করছেন, তা নিয়ে সতর্ক থাকবেন। বিশেষ করে ও কী করবে না-করবে এ জিনিসগুলো বুঝিয়ে বলার সময় বেশি সতর্ক থাকবেন। আগে এক জায়গায় আমরা বলেছিলাম 'এটা করো না'- এই কথাটা মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার করবেন না। গঠনমূলক বা ইতিবাচকভাবে ওদের ভুলগুলো ধরিয়ে দিন। আপনি কী চাচ্ছেন সেটা বলুন। যেমন- 'চিৎকার করো না তো'। এভাবে না-বলে বলুন, 'আস্তে কথা বল, বাবা'।

- বাচ্চার নেতিবাচক অভ্যাস বদলানোর জন্য আঘাত না-করে সহায়ক উপায় অবলম্বনের চেষ্টা করুন। যেমন : 'এত আলসেমি করো না' এভাবে না-বলে সে যেন মজাদার বা প্রোডাক্টিভ উপায়ে সময় কাটাতে পারে সে উপায় তালাশ করুন।[৬]

আট বছর বয়স পর্যন্ত বালক মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর দাদার সাথে ছিলেন। এরপর চলে যান তাঁর চাচার বাড়িতে। বিয়ে করার আগ পর্যন্ত ওখানেই ছিলেন। নবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর শৈশব-জীবনের শিক্ষাকে আমাদের বর্তমান জীবনে কীভাবে কাজে লাগিয়ে শিশু সন্তান প্রতিপালনে স্মার্ট হতে পারি, তার সংক্ষিপ্তসার তুলে এই অধ্যায় শেষ করছি।

নবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর শৈশব থেকে পাওয়া শিক্ষা

বিষয়	রাসূলের শৈশব	আপনার শিশুর
শৈশব আবেগ-অনুভূতি	শিশু মুহাম্মাদ ﷺ সবার ভালোবাসা পেয়েছিলেন। আদর-যত্ন পেয়েছিলেন। তাঁর ইমোশনাল প্রয়োজন পূরণে তাঁর মা বেশিরভাগ সময় দিয়েছেন।	আপনি আপনার সন্তানকে ভালোবাসুন। আদর করুন, যত্ন করুন। চুমু খান। জড়িয়ে ধরুন। তার প্রতি ভালোবাসার জানান দিন। এতে সে আপনার ভালোবাসা আরও গভীরভাবে অনুভব করবে। আর এভাবে তার ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স বিকশিত হবে।
বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শিতা	মরুভূমি থেকে শিশু মুহাম্মাদ ﷺ আত্মনিয়ন্ত্রণ, শৃঙ্খলা শিখেছিলেন। সেখানে খেলাধুলা, আনন্দ করার যথেষ্ট সুযোগ ছিল। ওখানে যা শিখেছিলেন পরিবারে এসে সেটা আরও জোরদার হয়েছে।	হুমকি-ধমকি বা শাস্তির ভয় ছাড়া আপনার শিশুর আচার-আচরণের উন্নতি হবে এমন পরিবেশ দিন। খেলাধুলার জন্য যথেষ্ট সময় দিন। কারণ এভাবেই শিশুরো সবচেয়ে ভালো শেখে।
ভাষা দক্ষতা	মরুভূমিতে থাকার কারণে শিশু মুহাম্মাদ ﷺ অনেকের সাথে কথা বলার সুযোগ পেয়েছেন। এতে করে নিজের অনুভূতি প্রকাশ ও যোগাযোগের দক্ষতা বেড়েছে।	বই পড়ার প্রতি আপনার সন্তানের মধ্যে ভালোবাসা জাগাতে সাহায্য করুন। তাকে গল্প বলুন। তার কথা মন দিয়ে শুনুন।
আত্মবিশ্বাস	শিশু মুহাম্মাদ ﷺ নিজের ব্যাপারে ও নিজের ভবিষ্যতের ব্যাপারে সবসময় উৎসাহমূলক কথাবার্তা শুনেছেন।	আপনার শিশুর প্রতিভা খুঁজে বের করুন। তার সাথে ভালো ব্যবহার করুন। মাত্রাতিরিক্ত সমালোচনা করবেন না।

রাসূল ﷺ-এর পরিবার

শিশুদের বেড়ে ওঠায় পরিবারের অন্যান্য সদস্যরাও ভালো ভূমিকা রাখতে পারে। বাবা-মা'র ওপর থেকে চাপ কিছুটা কমাতে পারে। রাসূল ﷺ এতিম ছিলেন। বর্ধিত পরিবারে বড় হয়েছেন। আত্মীয়স্বজনদের কাছে বিভিন্ন ঘটনা শুনে তিনি দয়াশীলতা, নেতৃত্বগুণ, লেগে থাকার মতো বিষয়গুলো হাতেকলমে শিখেছেন। আজকাল স্কুল, বন্ধুবান্ধব ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলো এক্ষেত্রে সহায়তা করতে পারে। আবার উল্টো ফলও এনে দিতে পারে। তবে যাই হোক, বাবা-মা'র বাইরেও শিশুদের অনুকরণীয় আদর্শ বা রোল মডেল প্রয়োজন। বর্ধিত পরিবারের কাজটা এখানেই। বর্ধিত পরিবারের সান্নিধ্য পাওয়া সম্ভব না হলে শিক্ষক, প্রতিবেশীরা এর বিকল্প ভূমিকা পালন করতে পারেন। এটা শিশুদের চিন্তাভাবনার পরিধি বাড়ায়। বৈচিত্র্যময় অভিজ্ঞতা দেয়।

বৈচিত্র্যময় অভিজ্ঞতা

এই অধ্যায়ে আমরা কথা বলব রাসূল ﷺ-এর বর্ধিত পরিবার নিয়ে। বর্ধিত পরিবার বলতে বাবা-মা ছাড়া পরিবারের অন্যান্য সদস্যদেরকে বুঝাচ্ছি। এই অধ্যায়ে আমরা রাসূল ﷺ-এর দাদা ও চাচা-চাচী সম্পর্কে জানব। রাসূল ﷺ-এর বেড়ে ওঠায় তারা বেশ বড় ভূমিকা পালন করেছিলেন।

বেশিরভাগ সীরাহ বইগুলোতে তাদের ভূমিকা নিয়ে সামান্যই কথা হয়। তবে আমরা যদি তার জীবনকে বুঝতে চাই তাহলে তাদেরকে জানাটা জরুরি।

কেউ কেউ ভাবেন বর্ধিত পরিবারের বিষয়টা অতিমাত্রায় জটিল। তারা বিষয়টার শাখা-প্রশাখায় নিজেদের হারিয়ে ফেলেন। আধুনিক আরবিতে সুদীর্ঘ নাম ব্যবহারের প্রচলন নেই। তো বর্ধিত পরিবার নিয়ে আলাপ করতে যেয়ে এত বড় বড় নামের তালিকা দিয়ে কী করবেন, সেটা হয়ত বুঝতে পারেন না কেউ কেউ। সুদীর্ঘ নামের বৃত্তে আমি ঘুরপাক খাবো না। কিংবা এগুলোর খুঁটিনাটিতে পড়ে থাকব না; বরং রাসূল ﷺ-এর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া অংশগুলো নিয়ে কথা বলব। এগুলো আমাদের গড়ে ওঠায় সাহায্য করবে। রাসূল ﷺ-এর পরিবারের সদস্যদের এমনভাবে তুলে ধরব, মনে হবে আপনি তাদের ব্যক্তিগতভাবে চেনেন।

পরিস্থিতি যা-ই হোক, নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ আনা নিয়ে আমরা প্রথম অধ্যায়ে কথা বলেছি। এখানে কথা বলব, আপনার বা আপনার সন্তানের অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ করতে বর্ধিত পরিবারের ভূমিকা নিয়ে। ঠিক যেমন প্রভাবময় ছিল রাসূল ﷺ-এর বর্ধিত পরিবার।

দাদা-দাদি, নানা-নানী, ফুফু-খালা, মামা-চাচা এদের সবাই আপনার শিশুকে বেড়ে ওঠায় সহযোগিতা করতে পারে। রাসূল ﷺ-এর বেলায় এই কাজটি করেছেন তাঁর দাদা ও চাচা। এতে বাবা-মা'র ওপর চাপ কমে। আর এতে অন্য লাভও আছে। একেকজনের জীবন-অভিজ্ঞতা ভিন্ন। যে কারণে শিশু একেকজনের কাছ থেকে একেক রকম অভিজ্ঞতার স্বাদ পায়। যদি বর্ধিত পরিবারে না-থাকেন, তাহলে ভালো বিকল্পের ব্যবস্থা করুন। যেমন- প্রতিবেশী বা শিক্ষক।

এখানে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, সন্তান লালন করার দায়িত্ব বাবা-মা একা পালন করবেন না। তাদেরকে বহু ধরনের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার মুখোমুখি করাবেন।

বর্ধিত পরিবার

বর্ধিত পরিবারে বাবা-মা, সন্তান, দাদা-দাদি, চাচা, ফুফু এবং কাজিনরা কাছাকাছি থাকেন। এ ধরনের পরিবারের গুরুত্বের বিষয়টা আরবি ভাষা থেকেও বুঝা যায়। ইংরেজিতে চাচা, মামা, ফুফা, খালু

সবকিছুর জন্য একটাই শব্দ: আঙ্কেল। আরবিতে আলাদা আলাদা চারটা শব্দ আছে। বাংলাতেও তা-ই। আবার কাজিনদের জন্যও আটটা ভিন্ন ভিন্ন আরবি শব্দ আছে।

পৃথিবীর ইতিহাসে বর্ধিত পরিবার সবসময়ই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কিন্তু বর্তমান সময়ে এর আবেদন হারিয়ে গেছে। ইউরোপে শিল্প বিপ্লবের পর ধীরে ধীরে এর প্রয়োজনীয়তা হারিয়ে যায়। কারণ এর আগে মানুষের জীবন কৃষি নির্ভর ছিল। ওখানে কাজেকর্মে একে অপরের সহযোগিতার দরকার ছিল। কিন্তু শিল্প বিপ্লবের পর সেটার আর প্রয়োজন ছিল না।

আমাদের সমাজেও এই পরিবর্তনের ঢেউ লাগে। বর্ধিত পরিবারের বন্ধনগুলো ঢিলে হয়ে যায়। তৈরি হয় একক পরিবার। সন্তান লালনপালনের পুরো দায়িত্ব তারা একাই পালন করেন। মা যদি কর্মজীবী বা অন্য কোনো কারণে ব্যস্ত থাকেন, তাহলে কাজের লোক এই দায়িত্ব নেয়।

আমাকে ভুল বুঝবেন না। আমি আপনাদের বলছি না যে চলুন, সবাই মিলে আবার এক ছাদের নিচে থাকা শুরু করি। পুরোনো সেই রোমান্টিক পরিবেশে ফিরে যাই। আমার মূল পয়েন্টটা হচ্ছে, সন্তান লালনপালনে পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা আবারও সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে শুরু করুক।

ইউরোপের কিছু দেশ কিন্তু বর্ধিত পরিবারের সেই ধারা ফিরিয়ে এনেছে। দ্যা টেলিগ্রাফ পত্রিকা ২০০৮ সালে একটা প্রতিবেদন ছাপিয়েছিল। সেখানে তারা বলেছে যে, ব্রিটেনের সাড়ে আট লাখ পরিবারে বাড়তি সদস্য থাকেন। তাদের ধারণা ২০২৮ সালের মধ্যে সেটা শতকরা ৩০ ভাগে পৌঁছাবে। প্রতিবেদনটিতে বলা হয়েছে, আলাদা থাকার কারণে সন্তান আর পিতামাতার দেখাশোনা করা অনেক স্বামী-স্ত্রীর জন্য কঠিন। সবাই মিলে যদি কাছাকাছি থাকেন, তাহলে এই কাজ সহজ হয়।

রাসূল ﷺ-এর পরিবার

রাসূলের ﷺ-এর পুরো নাম মুহাম্মাদ ইব্‌ন্ আবদুল্লাহ ইব্‌ন্ আবদুল মুত্তালিব ইব্‌ন্ হাশিম ইবনে আবদু মানাফ ইব্‌ন্ কুসাই। প্রথাগতভাবে আরবে সন্তানের মূল নামের শেষে বাবা অথবা মা'র বাবা, দাদা, বড় দাদার নাম যোগ করা হয়। আধুনিক আরবে এর কিছু কিছু নামের চল নেই। সংক্ষেপে তাই এগুলোর কিছু পরিচয় দিচ্ছি।

কুসাই

তার আসল নাম ছিল যাইদ। কিন্তু পরে কুসাই নামেই পরিচিতি হন। এ নামের অর্থ- 'অনেক দূরে'। অল্প বয়সে তিনি ঘর ছেড়ে গিয়েছিলেন বলে তাকে এই নামে ডাকা হতো।

আবদু মানাফ

আসল নাম আল মুগিরা। রাসূল ﷺ-এর দাদার দাদার দাদা। তার নামের অর্থ 'মানাফের দাস'। আরব মূর্তিপূজারীরা ইসলামের আগে মানাফ নামে এক মূর্তির পূজা করত। সংগত কারণেই এ নামের আর কোনো অস্তিত্ব নেই এখন।

হাশিম

আসল নাম আমর। হাজিদের সাহায্য সহযোগিতার কারণে তিনি হাশিম নামে পরিচিত হোন। নামের অর্থ- রুটি বিতরণকারী।

আবদুল মুত্তালিব

তার আসল নাম শাইবা। মক্কার লোকেরা তাকে দেখে মুত্তালিব নামে এক ব্যক্তির দাস মনে করেছিল। সেজন্য তারা ঐ নামে ডেকেছিল। পরে ওই নামেই তিনি পরিচিত হন।

রাসূল ﷺ তাঁর বংশের লোকদের ব্যাপারে জানতেন। তাদের অর্জনের ব্যাপারে জানতেন। মক্কার লোকদের একটা ঐতিহ্য ছিল। তারা গল্প-কবিতা দিয়ে তাদের পরিবারের কাহিনি গর্বের সাথে বলে যেত। বর্ধিত পরিবারের ভূমিকা কেবল জীবিতদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। যারা মারা গিয়েছেন তারাও এর অন্তর্ভুক্ত। বিশেষ করে তাদের যদি কোনো অনুপ্রেরণামূলক কীর্তি থাকে।

রাসূল ﷺ-এর পূর্বপুরুষ আর তাদের যেসব অর্জন তাঁকে প্রভাবিত করেছিল, সে ব্যাপারে কিছু কথা বলে নেওয়া যাক। কুসাইকে দিয়ে শুরু করি।

কুসাই: মক্কায় কুরাইশ গোত্র একসময় দুর্বল ছিল। বিভক্ত ছিল। তিনি কুরাইশ গোত্রকে এক করেন। তাদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করেন। তখন থেকেই মক্কার ইতিহাসে তিনি একজন গুরুত্বপূর্ণ মানুষ (Key Figure)। তার জন্ম মক্কাতে।

তবে বড় হয়েছেন মক্কার বাইরে। দীর্ঘ সময় পর সেখানে ফিরে খুযা গোত্রের এক মেয়েকে বিয়ে করেন। তখন খুযা গোত্র কাবার দায়িত্বে ছিল। কুরাইশ গোত্র এই মর্যাদাপূর্ণ দায়িত্ব পাক এমন এক আকাঙ্ক্ষা তার মধ্যে জেগে ওঠে। এজন্য তিনি তার গোত্রকে একতাবদ্ধ করেন এবং একসময় খুযা গোত্রকে সরিয়ে মক্কার রাজনৈতিক নেতৃত্ব তাদের হাতে চলে আসে।

তিনি তখন যেসব দায়িত্ব পালন করতেন-
১. মক্কায় ভ্রমণকারীদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা।
২. হাজিদের পানি, দই, মধু সরবরাহ।
৩. কাবার রক্ষণাবেক্ষণ।
৪. প্রয়োজনে যুদ্ধের সময় হাল ধরা।

তিনি একা একা মক্কা শাসন করতে চাননি। 'ফোরাম' নামে তিনি একটা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। সেখানে মক্কার অন্যান্য গোত্ররাও আলোচনায় বসত। নগর শাসন নিয়ে তাদের মতামত দিত। পরামর্শ দিত।

এখন সবচেয়ে মজার দিক হলো- কুসাই যে অবস্থায় ছিলেন, তাতে করে এ ধরনের স্বপ্ন ছিল দুঃস্বপ্ন। তার গোত্র বিভক্ত। তিনি বড় হয়েছেন মক্কার বাইরে। মক্কাবাসীদের কাছে তিনি বহিরাগতের চেয়ে বেশি কিছু না। তার তেমন কোনো সমর্থকও ছিল না। কিন্তু তিনি ছিলেন উচ্চাকাঙ্ক্ষী। প্রতিকূল পরিস্থিতি কাটিয়ে তিনি তার স্বপ্ন পূরণ করেছেন। মক্কাবাসীদের শ্রদ্ধা অর্জন করে নিয়েছেন। ইতিহাসবিদ ইবন হিশাম তাকে ধর্মের সাথে তুলনা করেছেন। মানুষ যাকে সারাজীবন অনুসরণ করতে পারে।

উনার এসব কৃতিত্বের কথা রাসূল অবশ্যই শুনে থাকবেন। পারিবারিক বিভিন্ন আলাপচারিতায় এসব প্রসঙ্গ উঠে আসা অস্বাভাবিক না। এ থেকে রাসূল যেটা শিখে থাকবেন সেটা হচ্ছে, কোনো কিছু পরিবর্তনের জন্য যে শক্তি দরকার সেটা নিজের থেকেই নিতে হবে। আশপাশ থেকে না। তা না হলে পরিবর্তন আনা সম্ভব না।

আবদু মানাফঃ মানুষ চিরকাল বেঁচে থাকে না। মানুষের প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়। কিন্তু আদর্শ চির অমলিন, চিরকালীন। অনুসারীরা যদি আদর্শের অনুসরণ না করে ব্যক্তিপূজা করে, তাহলে একসময় সেটা দ্বন্দ্বে রূপ নেবেই

নেবে। চেঙ্গিস খান, টেমারলেন, আলেকজান্ডার দ্যা গ্রেটের সময়ের পর এমনটাই হয়েছে। কুসাইয়ের মৃত্যুর পর মক্কাতেও তাই হয়েছে। কাবার দখল কে নেবে- এ নিয়ে তার দুই ছেলে আবদুদ দার ও আবদু মানাফের মধ্যে দ্বন্দ্ব লেগে যায়। এক পর্যায়ে তারা নিজেদের মধ্যে দায়িত্ব ভাগ করে নেয়।

সমাবেশ আয়োজন, প্রতিরক্ষার জন্য সেনা প্রস্তুত ও কাবার চাবি রক্ষণের ভার নেন আবদুদ দার। আর হাজিদের খানাপিনার দায়িত্ব নেন আবদু মানাফ। পরে এটা তিনি তার ছেলে হাশিমকে দেন। হাশিম ছিলেন রাসূল ﷺ-এর দাদার দাদা।

হাশিমঃ গরিব আর হাজিদের খাওয়ানোর বিষয়টাকে তিনি বেশ সিরিয়াসলি নিয়েছিলেন। তিনি তাদের সেরা উটের মাংস দিতেন। তার আর্থিক অবস্থা তেমন ভালো ছিল না। তবে তারপরও তিনি নিজের পকেট থেকে খরচ করতেন। কুরাইশদের কাছ থেকে দান নিতেন।
এক কবি হাশিমের প্রশংসায় বলেছেন,

> 'মক্কার ভুখানাঙাদের জন্য আমর দুধে ভেজা খাবার তৈরি করেছে; শীত আর গ্রীষ্মের কাফেলা প্রতিষ্ঠা করেছে'।

ক্ষুধার্তদের খানাপিনার ব্যবস্থা করায় কবি হাশিমের প্রশংসা করেছেন। শীতে ইয়েমেনে আর গরমে সিরিয়াতে বাণিজ্য কাফেলা পাঠানোর ঐতিহ্য পুনরায় চালু করায় তাকে কৃতিত্ব দিয়েছেন।

দান করতে হলে আপনার কাছে অনেক টাকা থাকতে হবে ব্যাপারটা এমন না। হাশিমের কাছ থেকে আমরা তো তা-ই শিখি। টাকাপয়সা ছাড়াও আপনি আপনার অভিজ্ঞতা শেয়ার করতে পারেন। অথবা সময় দিতে পারেন। এভাবেও মানুষের উপকার করা যায়। 'দান' করা যায়।

হজ্জের মৌসুমে বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষদের সাথে তাকে চলতে হয়েছে। এত মানুষের সাথে চলতে যেয়ে তাকে নিঃসন্দেহে অনেক চাপ সামলাতে হয়েছে। কখনো কখনো মানুষের কটু ব্যবহার সহ্য করতে হয়েছে। অবশ্যই এগুলো তিনি ধৈর্যের সাথে করেছেন। মানুষ তাঁর উদারতা ও সহনশীলতার কথা তাঁর মারা যাওয়ার পরও মনে রেখেছে উপরের কবিতাটা তার প্রমাণ। সুতরাং রাসূল ﷺ-ও যে এসব ঘটনা শুনে থাকবেন সেটা আশ্চর্যের না। হয়ত এসব ঘটনা থেকে তিনি অনুপ্রেরণাও নিয়ে থাকবেন।

রাসূল ﷺ-এর পূর্বপুরুষদের মধ্যে আরেকজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব তার নানা ওয়াহাব আবদু মানাফ। তিনি মদিনার এক প্রসিদ্ধ ব্যক্তি এবং গোত্র প্রধান ছিলেন। আমিনাকে তিনিই দৃঢ়চেতা হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন। যে কারণে আবদুল মুত্তালিব তার ছেলে আবদুল্লাহর সাথে তার বিয়ে দিতে রাজি হন।

আবদুল মুত্তালিব: আগেই বলেছি তার আসল নাম ছিল শায়বাহ। তিনি তার বাল্যকাল মদিনায় কাটিয়েছেন। মদিনার নাম তখন ইয়াসরিব। তার মায়ের নাম সালমা। তিনি তার উচ্চতা, সুদর্শন চেহারা আর স্বভাবজাত নেতৃত্বগুণের কারণে সবার কাছে পরিচিত ছিলেন। একসময় তিনি তার গোত্রের প্রধান হয়ে ওঠেন। মক্কার ইতিহাসে দুটো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা তার সাথে সম্পর্কিত। যথা-

১. যমযম কূপ পুনরায় খুঁজে পাওয়া
২. হস্তীবর্ষ

যমযম আবিষ্কার

জুরহুম গোত্র যমযম কুয়াকে ঢেকে ফেলেছিল। তারা ছিল নবি ইবরাহীম (আ)-এর ছেলে নবি ইসমাঈল (আ)-এর মামার গোত্র। মক্কাবাসীদের অনেক দিনের বাসনা ছিল আবার যদি কোনোভাবে তারা এই কূপের খোঁজ পেতেন! কিন্তু কেউ জানত না যে, এটা কোথায় হারিয়ে গেছে। পানির উৎসে খুঁড়তে যেয়ে রাসূল ﷺ-এর দাদা আবদুল মুত্তালিব এই কূপের মুখ খুঁজে পান। আনন্দে তার চোখমুখ ভরে গেল। মাটি থেকে তার দুহাতে পানি ছলকে উঠল। ঠিক যেমন উঠেছিল মা হাজেরার হাতে।

যমযম কূপ খুঁজে পাওয়ার পর মক্কার পানি সমস্যার একটা সুরাহা হলো বটে। কিন্তু কুরাইশ নেতাদের মধ্যে ঝামেলা লেগে গেল। আবদুল মুত্তালিবের হাতে এই কূপের নিয়ন্ত্রণে দেখে অনেকের ভালো লাগল না। তারা ঠিক করলেন সিরিয়ার এক যাজিকার মাধ্যমে এটার মীমাংসা হোক।

পথে যেতে যেতে নতুন বিপত্তি হলো। তাদের সঙ্গে নেওয়া সব পানি ফুরিয়ে গেল। পানির অভাবে সবাই ধরেই নিয়েছিল যে মৃত্যু সুনিশ্চিত। এমনকি তারা তাদের কবর পর্যন্ত খুঁড়ে ফেলেছিল। কিন্তু আবদুল মুত্তালিব

তা করলেন না। তিনি বললেন, 'মৃত্যুর কাছে আত্মসমর্পণ করা ব্যর্থতা'। যেভাবে কোমর বেঁধে তিনি যমযমের কূপ খুঁজায় লেগে ছিলেন, সেভাবে সেই অবস্থাতেও তিনি পানি খুঁজতে লাগলেন। একসময় পেয়েও গেলেন। সেই পানি খেয়ে সবার প্রাণ বাঁচল। তাদের মনে হলো পুরো ঘটনাটা আবদুল মুত্তালিবের পক্ষে মহান আল্লাহর বিধান। যমযম নিয়ে তারা তাদের আপত্তি ওখানেই ছেড়ে দেন।

যমযম কূপের মুখ খুঁজে পাওয়ার ঘটনা নতুনভাবে বলা আমার উদ্দেশ্য না। এই ঘটনাটা শুনে বাল্যকালে রাসূল ﷺ-এর মনে কী প্রভাব পড়েছিল সেটাই আমার উদ্দেশ্য। এই কাহিনিতে স্বপ্নপূরণে চোয়াল বাধা প্রতিজ্ঞার কথা বলা আছে। সমাজকে কিছু দেওয়ার কথা বলা আছে। পরিস্থিতি যা-ই হোক, আশেপাশের সব মানুষও যদি হাল ছেড়ে দেয়, তেমন পরিস্থিতিতেও হার না-মানা মানসিকতার কথা বলা আছে। কাহিনিটা আমাদে যেন বলছে, 'উঠে দাঁড়ান। চেষ্টা করুন। না পারলে আবার চেষ্টা করুন।'

রাসূল ﷺ তাঁর জীবনে কতবার কত কঠিন কঠিন সব সময়ের মধ্যে দিয়ে গেছেন। এরকম সময়ে এমন কিছু দরকার যা মানুষকে উৎসাহ দেয়। মনকে শক্ত করে। দাদার সেই ঘটনা নিঃসন্দেহে রাসূল ﷺ-এর কঠিন সময়ে উৎসাহ দিয়েছে।

জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা শেয়ার করে অনুপ্রাণিত করা পরিবারের বাড়তি সদস্যদের অন্যতম ভূমিকা। আপনার ও আপনার শিশু দুজনের জীবনেই তা প্রেরণা দিতে পারে। মানুষের পুরো জীবনই যে ঘটনাময়। কিন্তু দাদা-দাদি, নানা-নানিদের এ ধরনের বাস্তব অভিজ্ঞতার প্রভাব অনেক জোরালো।

হস্তীবর্ষ

কঠিন সময়গুলোতে মাথা ঠাণ্ডা রাখা, আতঙ্কিত না-হওয়া; বরং মহান আল্লাহর ওপর সবকিছু ছেড়ে দেওয়ার বিষয়গুলো হস্তীবর্ষের শিক্ষা।

ইয়েমেনে আবরাহা নামক এক খ্রিষ্টান শাসক ছিলেন। ইথিয়োপিয়ান। তিনি সেখানে একটি গীর্জা নির্মাণ করেন। তার ইচ্ছে ছিল, আরব উপদ্বীপের সব তীর্থযাত্রীর পুণ্যজায়গা হবে ইয়েমেনে তার বানানো এই গীর্জা। তার এই খায়েশপূরণে মূল প্রতিদ্বন্দ্বী কাবা। তাই তিনি ওটাকে মিটিয়ে দিতে চাইলেন। বিশাল সৈন্যবহর নিয়ে তিনি মক্কার উদ্দেশে যাত্রা শুরু করেন। রাসূল ﷺ যে বছর জন্ম নেন এটা সে বছরেরই ঘটনা। আরবে হাতির দেখা

পাওয়াটা অত্যন্ত বিরল ঘটনা। আবরাহার বাহিনীতে ছিল বিশাল হাতি। যে কারণে আরবেরা এই ঘটনাকে 'হস্তীবর্ষ' নামে মনে রেখেছিল।

এই বিশাল বাহিনীর সামনে বিনা যুদ্ধে হাল ছেড়ে দেওয়া ছাড়া আরবদের কোনো উপায় ছিল না। তবে আবদুল মুত্তালিবের মধ্যে এ নিয়ে কোনো আতঙ্কের ছাপ দেখা যায়নি। তিনি আবরাহার সাথে দেখা করতে চাইলেন। আবরাহার সৈন্যরা মক্কায় প্রবেশ মাত্রই লুটপাট শুরু করে দিয়েছিল। তারা আবদুল মুত্তালিবের উট ছিনতাই করেছিল। সেগুলো ফিরিয়ে নিতেই তিনি তার সাথে দেখা করেন।

আবদুল মুত্তালিবের কথা শুনে আবরাহার চোয়াল খুলে পড়ল। এই বৃদ্ধ বলে কী? আমরা তার শহর দখল করে নিয়েছি, তার দায়িত্বে থাকা কাবা ধ্বংস করতে এসেছি, কোথায় সে ওগুলোর মীমাংসার ব্যাপারে কথা বলবে; তা না, তিনি এসেছেন তার উটগুলো ফিরিয়ে নিতে! তিনি তাকে বললেন, 'আমি ভেবেছিলাম আপনি কাবার ব্যাপারে কথা বলতে এসেছিলেন। উট নিয়ে না'। আবদুল মুত্তালিব ঝটপট জবাব দিলেন, 'কাবার একজন প্রভু আছেন। তিনিই একে রক্ষা করবেন'।

আবরাহা কাবা ধ্বংস করার হুকুম দিলেন। কিন্তু তার হাতি এক চুলও নড়ল না। উপর থেকে পাখিরা নুড়িপাথর ফেলতে লাগল। সৈন্যদের দেহ গলে যেতে লাগল। বাকিরা পালিয়ে বাঁচল।

আরবদের চোখে এই ঘটনা ছিল অলৌকিক। পবিত্র শহর হিসেবে মক্কার মর্যাদা আরও বেড়ে গিয়েছিল।

কুরআনের ১০৫নং সূরায় এই ঘটনা বলা আছে-

> 'হস্তীবাহিনীর সাথে তোমার প্রভু কি করেছিলেন দেখেছ? তিনি কি তাদের পরিকল্পনাকে ধুলোয় মিশিয়ে দেননি? তিনি তাদের বিরুদ্ধে ঝাঁকেঝাঁকে পাখি পাঠিয়েছিলেন। পোড়া কাদামাটির নুড়ি বর্ষণ করেছেন। তাদের অবস্থা হয়েছিল ফসল তোলা খেতের মতো'।

আবদুল মুত্তালিব তার সন্তান আর নাতি-নাতনিদেরকে অসংখ্যবার এ ঘটনা বলে থাকবেন হয়ত। তিনি তাদের মধ্যে এই কথা গেঁথে দিয়েছিলেন যে, যেসব ঘটনা নিজের জীবনকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে, সেসব ঘটনায়

আতঙ্কিত হয়ো না। মাথা ঠাণ্ডা রাখো, বিশ্বাস রাখো আল্লাহ তোমার সাথে আছেন। তিনি তোমাকে ভুলে যাবেন না। অত্যাচারীদের ওপর তিনি কখনো খুশি নন। তার ঘরের অমার্যাদা তিনি কখনো বরদাশত করবেন না।

হতাশার কাছে হার মানবেন না। নিজের ন্যায্য অধিকার ছাড়বেন না; বরং ভদ্রভাবে সেগুলোর দাবি করুন। মনে রাখবেন, খারাপ সময়ের পর ভালো সময় আসে। কখনো উদ্ভটভাবে। কখনো-বা অপ্রত্যাশিতভাবে।

শেষ বিন্দু দিয়ে লড়াই করুন

যেসব অর্জন ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে, সেগুলোর বেশিরভাগই দুএকজনের কলিজার জোরে। টাকাপয়সা বা জনবলের আধিক্যের কারণে না। বলুন তো, কজন মিলে কাবাঘর বানিয়েছিলেন? ইব্রাহীম ও তাঁর ছেলে ইসমাঈল (আলাইহিমাস-সালাম)। মাত্র দুজন। অথচ লাখ লাখ লোক এখন সেখানে হজ্জ করে। যে যমযম কূপ থেকে হাজিরা পানি খায়, সেই কূপ খুঁজে পেলেন আবদুল মুত্তালিব।

আমি চাই, এই ঘটনা আপনাকে অনুপ্রাণিত করুক। উপায়-উপকরণ যত কমই হোক না কেন, আপনার সামর্থ্য যত অল্পই হোক না কেন, জীবনের শেষ বিন্দু দিয়ে লড়াই করুন। দেখবেন, আল্লাহ তায়ালার সাহায্য পেয়ে গেছেন। লড়াকুর কোনো পরাজয় নাই।

তিনি ও তার সঙ্গীরা যে চরম বিপাকে পড়েছিলেন, তাতে করে তিনি সহজেই হাল ছেড়ে দিয়ে বাকিদের মতো নিজের কবর খুঁড়তে পারতেন। কিন্তু তা না করে তিনি পানির উৎস খুঁজেছেন। পরে পেয়েছেনও। সেই পানি খেয়ে তিনিসহ বাকিদের প্রাণ বেঁচেছে। সুতরাং হাল ছাড়বেন না। সাফল্য আশেপাশেই ছড়িয়ে আছে। আবদুল মুত্তালিব যে পানির উৎস পেলেন হয়ত তার নিরাশ সঙ্গীদের পায়ের তলাতেই তা লুকিয়ে ছিল।

> 'নিদারুণ বেদনার সময় মনকে শক্ত করুন। এমনকি মৃত্যুমুখে হলেও। যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। আহত সিংহও জানে কীভাবে গর্জন করতে হয়'।
>
> স্যামুয়েল হানাগিদ, দশম শতাব্দীর ইসলামিক স্পেনের হিব্রুভাষী কবি

> 'জীবনের কঠিন দুঃখ মোকাবিলার সাহস রাখুন। ছোটগুলোতে ধৈর্য ধরুন। প্রচণ্ড খেটেখুটে প্রতিদিনের চ্যালেঞ্জ অর্জনের পর শান্তিতে ঘুমোতে যান'। ভিক্টর হুগো

রাসূল ﷺ-এর পরিবারের নারী সদস্যা

রাসূল ﷺ-এর পরিবারে নারীরাও সমানতালে অনুপ্রেরণা ছিলেন। আসুন এবার তাদের কয়েকজনের কথা জেনে নিই-

সালমা: হাশিমের স্ত্রী। বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের জন্য সুপরিচিত ছিলেন। রাসূল ﷺ-এর দাদা আবদুল মুত্তালিবকে তিনিই বড় করেছেন।

বারা আবদুল উয্যা: রাসূল ﷺ-এর নানী। আমিনার মতো বিশ্বস্ত স্ত্রী ও মমতাময়ী মা গড়ার কৃতিত্ব তার।

ফাতিমা আমর: রাসূলের দাদি। ছয় বছর বয়সে দাদার বাড়িতে পালিত হওয়ার সময় তিনিই রাসূল ﷺ-এর দেখাশোনা করেছেন।

পরিবারের এসব সদস্যরা কখনো গল্প শুনিয়ে, কখনো-বা নিজেদের জীবন কাহিনি শেয়ার করে শিশুদের বেড়ে তোলায় শিক্ষণীয় ভূমিকা পালন করতে পারেন।

রাসূল ﷺ-এর মা-বাবা

এখন আমরা কথা বলব, রাসূল ﷺ-এর মা-বাবা তার জীবনে কী ভূমিকা পালন করেছেন তা নিয়ে।

আমিনা

তিনি মদিনাতে জন্মেছিলেন। স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি চাইলে আবার সেখানে ফিরে যেতে পারতেন। কিন্তু একমাত্র পুত্র মুহাম্মাদের জন্য যাননি। মক্কাতেই থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।

রাসূল ﷺ-এর বাবার মৃত্যুর সময় তার বয়স হবে বড়জোড় বিশের কোঠায়। চাইলে তিনি আবার বিয়ের পিঁড়িতে বসতে পারতেন। সেটা না-করে তিনি বিশেষ গুণের পরিচয় দিয়েছিলেন। এটা অনেকের জন্যই অনেক বড় অনুপ্রেরণা হতে পারে।

তার শাশুড়ি ফাতিমার সাথে তার আন্তরিক সম্পর্ক ছিল। আবদুল্লাহর মৃত্যুর পর তা ছিঁড়ে যায়নি। যে কারণে মক্কাতে থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে তাকে বেগ পেতে হয়নি। বিধবা আমিনার সব খরচপাতির ব্যবস্থা করেছেন শ্বশুর আবদুল মুত্তালিব। এ থেকে বুঝা যায়, পুত্র আবদুল্লাহর মৃত্যুতেও তাদের অভ্যন্তরীণ সম্পর্ক চমৎকার ছিল।

বউ-শাশুড়ির যুদ্ধ নতুন কিছু না। গ্রিক ট্র্যাজেডিগুলোতেও এর উপস্থিতি পাওয়া যায়। আজকাল তো এটা কৌতুকের পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে। আমিনার সাথে শ্বশুরবাড়ির সুন্দর সম্পর্ক আমাদের বর্তমান সময়ের শ্বশুরশাশুড়ি ও বউদের অনুপ্রেরণা দেবে।

আবদুল্লাহ

আমরা জানি তিনি ২৫ বছর বয়সে মারা যান। তবে তিনি কিন্তু এর আগেও মারা যেতে পারতেন! যমযম কূপের খোঁজ পাওয়ার পর আবদুল মুত্তালিবের সাথে কুরাইশের অন্যান্য নেতাদের মধ্যে বিরোধ শুরু হয়। বিরোধের কারণ- যমযম কূপের দখল কে নেবে। সেই বিরোধের মীমাংসা হলে তিনি চাইলেন, এই কূপের উত্তরাধিকার দখল প্রজন্মের পর প্রজন্ম তার ছেলে-নাতিরা পাক। একবার মানত করলেন, আল্লাহ যদি তাকে দশটা ছেলে দেন, তাহলে তিনি তাদের মধ্যে একজনকে কুরবানী করে দেবেন।

আল্লাহ তাকে সত্যিই দশজন ছেলে দিলেন। একদিন তিনি তাদের সবাইকে খড়ের গাদা থেকে খড় টানতে বললেন। যে সবচেয়ে ছোট খড় টানবে তাকেই কুরবানী দেওয়া হবে। আবদুল্লাহ সবচেয়ে ছোট খড় টানলেন। তার বুক ধক করে উঠল। আবদুল্লাহকে কুরবানী দিতে হবে, এমনটা যে তিনি স্বপ্নেও ভাবেননি। তিনি ছিলেন তার সবচেয়ে কাছের আর আদরের ছেলে। হয়ত এ কারণেই নাতি মুহাম্মাদের প্রতিও তার টান বেশি ছিল।

তো তার কিছু বন্ধু তাকে বললেন, গণকের কাছে যেতে। সে হয়ত তাকে মানসম্মান বাঁচিয়ে কোনো বিকল্প বলে দেবে। তিনি গেলেন। গণক বলল ছেলের বদলে ১০০ উট কুরবানী দিতে। তিনি তা-ই করলেন।

এই ঘটনাও তিনি তার নাতিদের কাছে বলে থাকবেন। কিন্তু এই ঘটনা থেকে আমাদের কী ফায়দা?

- আপনাকে যারা সহযোগিতা করবে তাদের খোঁজ করুন (এক্ষেত্রে তার সন্তানেরা)।
- পরিবার দিয়ে অনুগৃহীত করায় মহান আল্লাহকে কৃতজ্ঞতা জানান।
- অন্যের উপদেশ শুনতে একগুঁয়ে হবেন না (এই ঘটনায় তার বন্ধুরা)।
- নিজের আইডিয়াগুলো অন্যদের জানান। ভালো ভালো আইডিয়া নিয়ে চুপ করে বসে থাকবেন না। কে জানে, হয়ত এমন কোনো আইডিয়াই অন্যের জীবন বাঁচাতে পারে।

আবদুল্লাহর কথায় ফিরে আসি। তিনি বেশ সুদর্শন ছিলেন। সন্দেহ নেই, তিনি অনেকের নজর কেড়েছিলেন। তবে তার পারিবারিক মর্যাদা, কাবাঘরের দায়িত্ব আর পারিবারিক ব্যবসার কারণে সতর্ক থাকতে হয়েছে, যাতে তাকে দিয়ে এমন কোনো কাজ না-হয় যেটাতে বংশের মুখে চুনকালি পড়ে। যাহোক, তিনি আমিনাকে বিয়ে করলেন। কিন্তু সে বিয়ের সুখ বেশিদিন স্থায়ী হলো না। ফিলিস্তিন সফরের সময় তিনি অসুস্থ হয়ে মারা যান। রাসূল ﷺ-এর জন্মের আগেই সন্তানের মুখ না দেখে পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন।

পরিবারের সুব্যবহার

রাসূল ﷺ এতিম ছিলেন। তবে একা ছিলেন না। পরিবারের অন্যান্যরা তাঁর বাবা-মা'র অভাব ঘুচিয়েছিলেন। তাদেরকে যারা চিনতেন তারা তাঁর কাছে তাদের গল্প করেছেন। এমনকি যারা সরাসরি তাদের চিনতেন না, তারাও তাদের কথা বলেছেন। তিনি মায়ের কাছ থেকে ত্যাগ শিখেছেন। বাবার কাছ থেকে ন্যায়পরায়নতা শিখেছেন। দাদার কাছ থেকে হার না-মানা মানসিকতার পাঠ নিয়েছেন। বড়দাদা হাশিমের কাছ থেকে দানশীলতা আর বড়দাদার দাদা কুসাইয়ের কাছ থেকে নেতৃত্বের গুণ শিখেছেন। তাঁর বর্ধিত পরিবার এভাবেই তাঁকে বেড়ে উঠতে সাহায্য করেছে। তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করেছে।

বর্ধিত পরিবার আজও আছে। কিন্তু ছেলেমেয়ে বড় করায় তাদের ভূমিকা আজ যেন হারিয়ে গেছে। সন্তান মানুষ করা আজ বাবা-মা'র একক দায়িত্ব হয়ে গেছে। এতে করে শিশুদের জগৎ ছোট হয়ে এসেছে। তাদের অভিজ্ঞতা সীমিত হয়ে পড়েছে।

মিশরীয় কবি আহমেদ শাওকি বলেন,

> 'মা শিক্ষক। তবে পরিবার আরও বড় শিক্ষক। পরিবারের প্রতিটি সদস্যদের আছে নিজস্ব কিছু অভিজ্ঞতা। এগুলো ছেলেমেয়েদের বড় করতে সাহায্য করে। কিংবা শিশুর জীবন বদলে দিতে সাহায্য করে।'

ইতিহাস জুড়ে অনেকে বড় বড় মানুষ তাদের সাফল্যের পেছনে কোনো চাচা-মামা বা দাদা-নানার কথা বলেছেন। বাবা-মা'র কথা বলেননি। তাই বর্ধিত পরিবারের সুব্যবহার করুন। তাদের সবাইকে সক্রিয় শিক্ষক বানান। আপনার সন্তানের ভবিষ্যৎ জীবনে এদের কার শিক্ষা কাজে লাগবে কে জানে!

সন্তানকে বর্ধিত পরিবারের সাথে জুড়বেন কীভাবে?

অনেক পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা একসাথে থাকেন না। ভিন্ন শহরে বা ভিন্ন কোনো দেশে থাকেন। যে কারণে বাচ্চাকাচ্চারা তাদের প্রতি টান অনুভব করে না। সেক্ষেত্রে তাদের সাথে সন্তানদের ভালো সম্পর্ক করাটা একটা চ্যালেঞ্জ। এখানে আমরা কিছু বাস্তব আইডিয়া তুলে ধরছি-

- মোবাইলে ছবি দেখিয়ে তাদের পরিচয় করিয়ে দিতে পারেন। তার নাম, নামের অর্থ, তাদের ব্যাপারে অনুপ্রেরণামূলক কোনো ঘটনা শেয়ার করুন। যেভাবে রাসূল ﷺ-এর বর্ধিত পরিবারের সদস্যদের ঘটনা আমরা এ অধ্যায়ে বলেছি।
- সন্তানকে তার বংশগাছ দেখান। দেওয়ালে আঁকতে পারেন। কিংবা বড় আর্ট পেপারে। পরিবারের সদস্যদের কিমাত, কেন তাদের দরকার এগুলো তুলে ধরুন।
- অন্য যেকোনো সময়ের চেয়ে আজকাল দূরের মানুষদের সাথে যোগাযোগ করা সহজ। স্কাইপে, মেসেঞ্জার, হোয়াটস অ্যাপের মতো অ্যাপগুলোর সঠিক ব্যবহার করুন।

বর্ধিত পরিবারের বিকল্প

অনেক সময় এমন হয় যে, বর্ধিত পরিবারের সদস্যরা কাছাকাছি থাকেন না। অথবা হতে পারে তারা সেই অর্থে সন্তানের বেড়ে ওঠার ক্ষেত্রে সহায়ক নন। তাদের কাছে থাকলে সন্তান ভুল শিখবে। এক্ষেত্রে ভালো বিকল্প খুঁজতে হবে। ভালো বিকল্প হতে পারেন শিক্ষক, প্রতিবেশী। সন্তান বড় করার ভারটা যেন শুধু বাবা-মা'র একার ওপর না-পড়ে এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

এ অধ্যায়ে আমরা রাসূলের বর্ধিত পরিবারের ব্যাপারে কথা বলেছি। তাদের কারও কারও নাম, তারা কী করতেন সেসব জেনেছি। তাদের কোন কোন ঘটনা বা দিক রাসূল ﷺ-এর জীবনে প্রভাব ফেলে থাকবে সেগুলোর উল্লেখ করেছি। নিচের টেবিলে আমরা দেখাব কীভাবে আমরা রাসূল ﷺ-এর জীবনের শিক্ষাগুলো বাস্তবে আমাদের সন্তান বড় করতে কাজে লাগাতে পারি। যাতে করে আমাদের পরিবারের বর্ধিত সদস্যরা আরও সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়।

রাসূল ﷺ-এর পরিবারের সদস্যগণদের থেকে শিক্ষা	
রাসূল ﷺ-এর পরিবার	**আপনার পরিবার**
রাসূল ﷺ এতিম অবস্থায় বড় হয়েছেন। কিন্তু তাই বলে তিনি একাকী বেড়ে ওঠেননি। তার পরিবারের বর্ধিত সদস্যগণ তার বাবা-মা'র অভাব দূর করেছিলেন।	আপনার পরিবারের বর্ধিত সদস্যরা সন্তানের একাকিত্ব দূর করে। যখন সে একাকী অনুভব করবে, তখন তারা সাথে বেড়াতে যেয়ে, রাতে থেকে তার একাকিত্বের কষ্ট দূর করে দিতে পারে।
শিশু মুহাম্মাদ ﷺ-কে তাঁর বর্ধিত পরিবার শিখিয়েছে। অনুপ্রেরণা দিয়েছে।	আপনার বর্ধিত পরিবার আপনার সন্তানকে অনুপ্রাণিত করতে পারে। বিশেষ করে তাদের অনুপ্রেরণামূলক বিভিন্ন কাহিনি শেয়ার করার মাধ্যমে।
বর্ধিত পরিবার বালক মুহাম্মাদ ﷺ-কে অনেক কিছু শিখিয়েছে। দাদার কাছ থেকে নেতৃত্ব, মা'র কাছ থেকে মমতা, চাচার কাছ থেকে ব্যবসা ইত্যাদি।	আপনার বর্ধিত পরিবারের সদস্যরাও এরকম নানা কিছু শিশুকে শেখাতে পারেন। যেটা আপনার একার পক্ষে সম্ভব না। আপনিও এতে উপকৃত হতে পারেন।
বর্ধিত পরিবার বালক মুহাম্মাদ ﷺ-কে নিরাপত্তা দিয়েছিল। গরিব হলেও সম্ভ্রান্ত পরিবার।	আপনার শিশুকেও তারা অনুরূপ নিরাপত্তা দিতে পারে। বিশেষ সুবিধা পাওয়া সন্তান এরকম অনুভব করার চেয়ে সে যে ভালোবাসাময়, ঐক্যবদ্ধ পরিবারের অংশ সেটা অনুভব করা বেশি জরুরি।

রাসূল ﷺ-এর চারপাশ

আশেপাশের পরিবেশ আমাদের প্রভাবিত করে। তবে সেটা পুরোপুরি আমাদের গড়ে দেয় না। কঠিন বা প্রতিকূল পরিস্থিতি নিয়ে অভিযোগ করতে থাকলে কোনো কাজ হয় না; বরং সক্রিয়ভাবে এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হয়। আমার সমাজ আমার পাশে না-দাঁড়ালে আমাদেরকেই রুখে দাঁড়াতে হবে। রাসূল ﷺ যখন কিশোর বা তরুণ, তখনো তিনি কিন্তু নবি হননি। তবে তাঁর মধ্যে একটা মজবুত বিশ্বাস ছিল। সে বিশ্বাস অনুযায়ী তিনি বিদ্যমান সুযোগগুলোকে কাজে লাগিয়েছিলেন। নিজেকে বিকশিত করেছিলেন। সমাজ যখন আমাদের ওপর চেপে আসবে, বেশিরভাগ লোকদের মনমানসিকতার সাথে মিশে যেতে জোরাজুরি করবে, তখন নিজেদের ও আশপাশের পরিবেশের ওপর নিয়ন্ত্রণ খাটাতে হবে। আমাদের সুবিধায় ব্যবহার করতে হবে।

আপনার প্রভাব-বলয় বাড়ান

আগের অধ্যায়ে আমরা আট বছর পর্যন্ত রাসূল ﷺ-এর বাল্যকাল নিয়ে কথা বলেছি। তাঁর বেড়ে ওঠায় তাঁর মা, দুধ-মা, পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের অবদান নিয়ে কথা বলেছি। এখানে আমরা কথা বলব মক্কায় রাসূল ﷺ যে পরিবেশে মানুষ হয়েছেন, সেই পরিবেশ, সেখানকার লোকজন আর সমাজের ব্যাপারে।

চৌদ্দ শ বছর আগে রাসূল ﷺ কোনো-না-কোনো পরিবেশে বড় হয়েছেন, তার সাথে আজকের জমানার লেনাদেনা কী? এমন প্রশ্ন মনে আসা স্বাভাবিক। সময় তো এখন আর আগের মতো নেই। মূর্তি, উট কিংবা তলোয়ারের মতো বিষয়গুলো আধুনিক সমাজে অচল। আমরা এখানে সেই সময়ের মক্কার পরিবেশে খুব বেশি ভেতরে যাব না। তখনকার মানুষের মনমানসিকতা, চালচলন বুঝার জন্য যতটুকু প্রয়োজন আমরা শুধু সেটুকুর ব্যাপারে কথা বলব।

রাসূল ﷺ যে পরিবেশে মানুষ হয়েছেন, সে পরিবেশের অবস্থা ফুটিয়ে তোলা আমার উদ্দেশ্য। কারণ, কারও জীবন বুঝতে হলে এটা বুঝা জরুরি। আমি চাই, পাঠকরা যে পরিবেশে আছেন, তারা যেন সেটা নিয়েও ভাবেন। কীভাবে সেখানে নিজেদের গড়ে তুলতে পারেন সেটা নিয়ে ভাবেন।

নিজের পরিবেশকে ছাঁচ দেওয়া

রাসূল ﷺ তাঁর জীবনের ৮৫ ভাগ সময় মক্কায় কাটিয়েছেন। ৬৩ বছরের মধ্যে ৫৩ বছর। বহু পরিবারে, বহু ঘরে, নানা পরিবেশে, নানা কাজে কাটিয়েছেন। বিয়ের পর তাঁর নিজের একটা পরিবার হয়। তাঁর বেশকিছু বন্ধুবান্ধবও ছিল।

প্রতিটা পরিবেশে এমন কিছু থাকে, যা সেখানকার মানুষের ওপর কোনো না কোনোভাবে প্রভাব ফেলে। তবে এখানে মজার বিষয় হচ্ছে, তখনকার পরিবেশে বড় হয়েও কীভাবে রাসূল ﷺ নিজেকে আলাদা করেছিলেন। অথচ সেই একই পরিবেশে বেশিরভাগ মানুষই নিজেদের হারিয়ে ফেলেছিল।

মানুষ তার পরিবেশের ফল। তবে এর মানে এই না যে, এ কারণে তাকে তার নিজের ব্যক্তি স্বাতন্ত্র হারিয়ে ফেলতে হবে। আমরা দেখব, কীভাবে রাসূল ﷺ আশেপাশের মানুষের সাথে নিজের ব্যক্তিত্ব ও আদর্শ বজায় রেখে চলেছেন। যেসব কাজ শুধু পুরুষদের কাজ বলে বিবেচিত, সেগুলোতে তখনকার কিছু নারীরা বাধা ঠেলে জয় করেছিলেন, উজ্জ্বল হয়েছিলেন। সেগুলোও দেখব। দেখব আরবদের মধ্যে থেকেও কীভাবে অনেক অনারব নিজেদের জায়গা করে নিয়েছিলেন। মূর্তিপূজারীদের শেকড় ছিল যেখানে, সেরকম প্রতিকূল পরিবেশে থেকেও কীভাবে এক আল্লাহর দাসত্বকারীরা আলাদা হয়েছিলেন।

এরা সংখ্যায় কম ছিলেন। অনেকে এদের গোনায় ধরতেন না। কিন্তু সমাজের প্রচলিত আদর্শে তারা গা ভাসিয়ে দেননি। নিজের লোকজন বা সমাজের প্রতি অনুগত থেকেও কীভাবে নিজের বিবেক বিসর্জন দেবেন না, নিজের স্বাতন্ত্র ধরে রাখবেন এ ব্যাপারে এ অধ্যায় আপনাকে অনুপ্রেরণা দেবে।

অন্ধভাবে সমাজের রীতিনীতি গায়ে মাখবেন না। আপনি এ কাজটা কেন করেন, এ ধরনের কথা জিজ্ঞেস করলে দেখবেন বেশিরভাগ লোকই বলবে, 'লোকে করে, তাই করি'। বা 'এভাবেই চলে আসছে'। তারা এগুলো নিয়ে চিন্তাভাবনা করে না। আপনি এমন হবেন না। আপনার আদর্শ, আপনার উচ্চাকাঙ্ক্ষার সাথে কোনটা খাপ খায়, সেভাবে ভেবে সিদ্ধান্ত নিন।
মক্কা আর মক্কার লোকজন দিয়ে শুরু করি।

মক্কা

মক্কার অবস্থান সাউদি আরাবিয়ার পশ্চিমে। মিশর থেকে সুদান পর্যন্ত বিস্তৃত লোহিত সাগরজুড়ে এর অবস্থান। আয়তন প্রায় ৫ শ বর্গকিলোমিটার। মক্কায় অনেক পাথুরে পাহাড় চোখে পড়ে। এগুলোর কোনো কোনোটার উচ্চতা ৬ শ মিটার। প্যারিসের আইফেল টাওয়ারের চেয়েও দ্বিগুণ। গরমকালে এখানে গড় তাপমাত্রা ৪৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। শীতকালে ২৫ ডিগ্রি।

রাসূল ﷺ যখন মক্কায় পুনরায় ইসলামি জীবনব্যবস্থা চালু করেন, তার অনেক আগে থেকেই কিন্তু কাবাঘরের কারণে মক্কা সুপরিচিত ছিল। স্থানীয়দের মধ্যে এক ধরনের নিরাপত্তা আর স্থিতিশীলতা বিরাজ করত সবসময়। আপনি দেখবেন, অন্যান্য শহরগুলো তখন নিজেদের নিরাপত্তার জন্য চারিদিকে শক্ত প্রাচীর বানাত। দুর্গ নির্মাণ করত। সম্ভাব্য শত্রুর হামলা থেকে বাঁচার জন্য এ রকম আরও অন্যান্য প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা তৈরি রাখত। কিন্তু মক্কার সুরক্ষায় এ রকম কোনো ব্যবস্থা ছিল না। ঐতিহ্যগতভাবে এখানে লড়াই নিষিদ্ধ ছিল।

ইসলাম আসার আগে ওখানকার লোকজন বহু দেবদেবী, মূর্তির পূজা করত। এসব মূর্তির একটা করে ভাস্কর্য মক্কায় রাখা থাকত যাতে যুদ্ধবিরতি

বজায় থাকে। প্রত্যেক অঞ্চলে বা গোষ্ঠীতে আলাদা আলাদা ঈশ্বর ছিল। যেমন তায়েফের লোকদের প্রধান দেবীর নাম ছিল আল্লাত। মদিনার লোকেরা পূজা করত মানাতের।

মক্কায় প্রায় ৩৬০টি ভাস্কর্য বা মূর্তি ছিল। এগুলো ছিল আরবদের দেবদেবীর প্রতীক। তো এ কারণে কলহপ্রবণ গোত্রগুলো মক্কাকে পবিত্র শহর হিসেবে সম্মান করত।

বিশেষজ্ঞদের অনুমান ষষ্ঠ ও সপ্তম শতকে মক্কায় প্রায় বিশ হাজারের মতো লোকজনের বসতি ছিল। আশেপাশের এলাকা গোষ্ঠী অনুযায়ী বিভক্ত ছিল। যাদের পূর্বপুরুষ এক তারা সবাই এক গোষ্ঠীর সদস্য।

মক্কার প্রধান গোষ্ঠী ছিল কুরাইশ। রাসূল ﷺও এই গোষ্ঠীর। তাদের পূর্বপুরুষ নাযর। রাসূল ﷺ-এর জন্মের প্রায় ১২ প্রজন্ম আগের। কাবার আশেপাশেই তাদের ঘরদোর ছিল। তারা কাবার রক্ষণাবেক্ষণ করত। তীর্থযাত্রীদের দেখাশোনা করত।

সমাজ

আমরা এখন দেখব সপ্তম শতকে মক্কার সামাজিক পরিবেশ কেমন ছিল সেটা। নারীদের ভূমিকা এবং সংখ্যালঘু অনারবরা কীভাবে সামাজিক বাধা টপকে নিজেদের জায়গা করে নিয়েছিলেন সেটাও দেখব।

প্রতিটা গোষ্ঠীতে অনেকগুলো গোত্র ও বাড়তি পরিবার ছিল। যেমন কুরাইশ গোষ্ঠীর পূর্বপুরুষ নাযর। কিন্তু এর মধ্যে দশটা গোত্র ছিল। এসব গোত্রের প্রধান ছিল নাযরের দশ পুত্র। সমাজের প্রকৃতি ও মানুষের মনমানসিকতার ওপর গোষ্ঠীয় কাঠামোর বড়সড় প্রভাব ছিল। যে গোষ্ঠী যত শক্তিশালী, সেই গোষ্ঠীর মানুষজন নিজেদের তত বেশি নিরাপদ মনে করতেন। কেউ হামলা করলে সেই হামলাকারীর পুরো গোষ্ঠীকে তার দায় বহন করতে হতো। খেসারত হিসেবে সবাই মিলে 'রক্তমূল্য' দিত।

কোনো ফুটবল দলের কট্টর সমর্থকরা যেমন সেই দলের চরম অনুগত, সেই সময়ের গোষ্ঠীর লোকদের বিশ্বস্ততা ছিল তেমন। গোত্রের প্রথম পূর্বপুরুষের সাথে যার সম্পর্ক যত কাছের, তার বিশ্বস্ততা তত বেশি। গোত্রবন্ধনের

উদাহরণ নিয়ে একটা আরবি প্রবাদ আছে: 'আমি আমার ভাইয়ের বিরুদ্ধে, আমার ভাই ও আমি আমার চাচাতো ভাইয়ের বিরুদ্ধে। কিন্তু আমি ও আমার চাচাতো ভাইয়েরা সবাই অপরিচিত লোকের বিরুদ্ধে'।

একই গোত্রের মধ্যে সহজেই মারামারি লেগে যেত। কুরাইশ গোত্রের নেতা কুসাইয়ের মৃত্যুর পর তার ছেলেদের মধ্যে মারামারি লেগে যায় কাবার দখল নিয়ে (পরের অধ্যায়ে এ ব্যাপারে আরও কথা আছে)।

তবে গোত্রের প্রতি বিশ্বস্ততার মানে এই না যে, কেউ আজীবন তার সঙ্গে থাকবে। গুরুতর কোনো অপরাধের কারণে গোত্রপতিরা মিলে কাউকে বের করে দিতে পারত। যে বের হয়ে যেত তার কপালে আরও শনি ছিল। কারণ, তখন কেউ আর তাকে নিরাপত্তা দিত না। ফলে যে কেউ চাইলে তার ওপর হামলা করতে পারত। সে হতো সহজ শিকার। চাইলে কেউ তাকে মেরেও ফেলতে পারত।

এই অঞ্চলের প্রধান উন্মুক্ত বাজারের নাম ছিল সুক উকাজ। কোনো কোনো গোষ্ঠী আনুষ্ঠানিকভাবে বহিষ্কৃত সদস্যের নাম সেখানে জানিয়ে দিত। মদ খাওয়া নিয়ে আল-বাররাদ ইবন কাইস তার গোষ্ঠীর নামহানি করেছিল। তার গোষ্ঠী ৫৯০ সালে বাজারে তাকে ঘোষণা দিয়ে বহিষ্কার করে। কখনো কখনো কোনো কোনো সদস্য এক গোষ্ঠী থেকে বের হয়ে অন্য গোষ্ঠীতে যোগ দিতে পারত। সেক্ষেত্রে তারা তখন সেই গোষ্ঠীর পূর্ণ নিরাপত্তা ভোগ করত। অনেকটা আজকের যুগের সিটিজেনশিপ বা নাগরিকত্ব দেওয়ার মতো। তবে দ্বৈত নাগরিকত্বের মতো দুই গোত্রের অধীনে থাকার সুযোগ ছিল না।

পারস্পরিক শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখার জন্য আজকাল যেমন আন্তর্জাতিক জোটচুক্তি হয় তখনও হতো। তখন আন্তগোষ্ঠীয় চুক্তি হতো। যেমন তীর্থযাত্রীদের ভালোভাবে দেখাশোনার জন্য কুরাইশরা মক্কার অন্যান্য গোষ্ঠীর সাথে জোট বেধেছিল। সিরিয়া ও ইয়েমেনে তাদের দুটো বাণিজ্য কাফেলা যেত। তো ওগুলো যেন নিরাপদে যাওয়া-আসা করতে পারে, সেজন্য তারা আরব উপদ্বীপের অন্যান্য বিভিন্ন গোষ্ঠীর সাথে বাণিজ্য চুক্তি করে। সূরা কুরাইশে এর উল্লেখ আছে।

গোষ্ঠী আর গোষ্ঠীর সদস্যের মধ্যে যেমন পারস্পরিক নিরাপত্তার অলিখিত চুক্তি ছিল, এসব জোটের মধ্যেও অনুরূপ চুক্তি ছিল। কোনো এক গোষ্ঠীর উপর হামলা মানে পুরো জোটের উপর হামলা।

সেই সমাজে আরেক ধরনের সম্পর্ক ছিল- জাওয়ার। কোনো লোক যদি ভিন্ন কোনো অঞ্চলে সফরে যেত, তাহলে তার গোষ্ঠী সেই অঞ্চলের স্থানীয় কোনো গোষ্ঠী বা প্রভাবশালী ব্যক্তির কাছে নিরাপত্তার আবেদন করতে পারত। আজকের দিনে আন্তর্জাতিক শরণার্থী ব্যবস্থা অনেকটা এর আদলেই তৈরি।

নারী

সমাজ নারীদের প্রতি নিষ্ঠুর ছিল। তখন লড়াই আর কাজেকর্মে পুরুষদের দাম দিত। ইসলাম আসার আগে কমন কিছু কাজের মধ্যে ছিল-

- মেয়ে জন্ম দেওয়ার কারণে স্ত্রীকে ছেড়ে দিত।
- বহুবিবাহের কোনো সীমা ছিল না। এক পুরুষ একাধিক বোনকে একসাথে বিয়ে করতে পারত।
- বিয়ের পর অন্য নারীদের সঙ্গে সম্পর্ক গ্রহণযোগ্য ছিল।
- ছেলে সন্তানের আশায় যদি মেয়ে সন্তান হতো তাহলে সেই মেয়েকে জ্যান্ত কবর দেওয়া হতো। কী নৃশংস! কুরআন পরে এই চর্চা নিষিদ্ধ করে। আত তাকভীর : আয়াত ৮-৯

নারীদের প্রতি সমাজে এত উল্টোস্রোত থাকার পরও কিছু নারী সমাজে নিজেদের আলাদা অবস্থান করে নিতে পেরেছিলেন। পুরুষরা তাদেরকে তাদের সমান ভাবত। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন-

- **খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদ:** বিশিষ্ট ব্যবসায়ী। যুবক মুহাম্মাদ ﷺ-কে তার ব্যবসা দেখাশোনার কাজে নিয়োগ দেন। পরে তাঁকে বিয়ে করেন।
- **আরওয়া বিনতে হারব:** আবু লাহাবের স্ত্রী। তার প্ররোচনাতেই আবু লাহাব তার ভাতিজার বিরুদ্ধে উঠেপড়ে লেগে ছিল। শুধু তাই না, তার প্রভাব এত বেশি ছিল যে, তিনি তার দুই ছেলেকে দিয়ে রাসূল ﷺ-এর দুই মেয়েকে তালাক দেওয়ান।

ইসলামে এই দুই নারীর অবস্থান সম্পূর্ণ ভিন্ন দুই প্রান্তে। তবে তারা দুজনই যে সমাজের প্রচলিত রীতির বিরুদ্ধে নিজেদের জায়গা করে নিয়েছিলেন, সেক্ষেত্রে দুজনেই এক।

ব্যবসায়ী হিসেবে খাদিজা (রা) বিচক্ষণ ছিলেন। ব্যবসাপাতির সবকিছুতে তখন ছিল পুরুষদের একচেটিয়া আধিপত্য। এ রকম পরিবেশেও তিনি তার বিচারবুদ্ধি ও পুঁজির সফল প্রয়োগ করেছিলেন। আপনার পরিস্থিতিও এমন হতে পারে। আপনার পরিবার, জীবনসঙ্গী বা বস আপনার সমর্থন না-ই করতে পারে। ওসব গায়ে না মেখে আপনি বরং নিজের প্রতিভা বের করে সেটা কাজে লাগান।[২]

বিদেশিরা

আফ্রিকা, সিরিয়া, মিশর, ইরাকের ব্যবসায়ী ও কারিগরদের অনেকে মক্কায় থাকতেন। এদের মধ্যে দাস ও স্বাধীন উভয় ধরনের মানুষ ছিলেন। তারা ছিলেন আরব অনারবের মিশ্র। এদের বেশিরভাগই বাইজেন্টাইনের খ্রিষ্টানদের অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে এখানে পালিয়ে এসেছিলেন। অন্যান্যদের মধ্যে কেউ কেউ মক্কা ও তার আশেপাশের এলাকায় কাজের খোঁজে এসেছিলেন।

এদের সংখ্যা ঠিক কত সে ব্যাপারে জানা যায় না। তবে বিভিন্ন উৎস থেকে ধারণা এদের সংখ্যা কয়েক শ হবে। ধর্মবিশ্বাসে এরা খ্রিষ্টান। কামার, ট্যানার, স্বর্ণকার ও অন্যান্য কারিগরি দক্ষতায় এদের কদর ছিল। তাছাড়া স্থানীয় জনগণের সাথে তাদের সদ্ভাব ছিল।

মজার ব্যাপার হচ্ছে, এদের কিন্তু কোনো গোষ্ঠীয় নিরাপত্তা ছিল না। তারপরও এরা তাদের বিশেষ দক্ষতা আর প্রতিভার কারণে সমাজে সফল হয়েছিলেন। যেমন-

- **জাবরা আর-রুমি:** তিনি পেশায় ছিলেন কামার। ধর্মগ্রন্থের প্রতি প্রবল আকর্ষণ ছিল। রাসূল ﷺ-এর ভালো বন্ধু ছিলেন। মূর্তিপূজারি আরবদের কেউ কেউ এজন্য দাবি করেছিল যে, এই লোকই নবিকে কুরআন শিখিয়েছে। কুরআনের এক আয়াতে এই অভিযোগের উল্লেখ আছে,

'আমি ভালো করেই জানি তারা কী বলে। তারা বলে, 'নবিকে তো এক লোক এসব শিখিয়ে দেয়'। তারা যে লোকের কথা বলে তার ভাষা তো অনারবি। অথচ এই কুরআন স্পষ্ট আরবিতে'। আন নাহল : ১০৩

- **ইয়াসার আর রুমি:** তিনি জাবরার বন্ধু। ধর্মগ্রন্থের প্রতি তারও বেশ আগ্রহ ছিল। দুজনের নামের শেষে রুমি আছে বলে ভাববেন না তাদের মধ্যে পারিবারিক কোনো সম্পর্ক আছে। রুমি নামে বিখ্যাত এক সুফি কবি আছেন। এর মানে আসলে 'রোমান' বা 'বাইজেন্টাইন'। ঐ অঞ্চল থেকে যারা আসত তাদেরকে এই নাম দেওয়া হতো।
- **সুহাইব আর রুমি:** মক্কায় এসেছিলেন এক কাপড়ে। কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যেই সেখানকার শীর্ষস্থানীয় ব্যবসায়ীর খাতায় নাম লেখান।

এছাড়াও আরও অনেক বিদেশি ছিলেন। যেমন পারস্যের সালমান ফারসি। সিরিয়ার বালা'আম সুরি। ইথিয়োপিয়ার বিলাল হাবশি। কপটিক এক কাঠমিস্ত্রী ছিলেন। তার নাম জানা যায় না।

সেই সময়ের আরবে ভাষাদক্ষতার আলাদা কদর ছিল। তাদের ভিন্ন মর্যাদায় দেখা হতো। কিন্তু অনারবরা কথা বলতেন ভাঙা ভাঙা আরবিতে। তবে তাদের জ্ঞান ও দক্ষতার কারণে তারা অন্যদের ছাড়িয়ে যান।

ক্ল্যাসিকাল আরবি জানেন না বলে আজকাল অনেকে হীনমন্যতায় ভোগেন। কিন্তু মক্কায় ভিনদেশিদের সাফল্য আমাদের ভিন্ন কথা বলে। নিজের দুর্বল দিক নিয়ে পড়ে থাকার মানে হয় না; বরং নিজের শক্তির দিকগুলো ঝালাই করার দিকে অনুপ্রেরণা দেয়।

টম রুথ তার স্ট্রেনথ্স ফাইন্ডার ২.০ বইতে বলেছেন, নিজের কমতিগুলো পূরণ করার চেয়ে শক্তির দিকগুলো বিকশিত করার পেছনে শ্রম দিলে সাফল্যের সম্ভাবনা কয়েকগুণ বেড়ে যায়। তিনি গবেষণা করে দেখেছেন, যারা নিজেদের শক্তির দিকটাতে বেশি ফোকাস করেন, তারা তাদের কাজে ছয়গুণ বেশি মগ্ন থাকতে পারেন। সাধারণভাবে তাদের জীবনের মান তিনগুণ বেশি থাকে বলে তারা বলে থাকেন।[৩]

আমি কাউকে আরবি ভাষা বা অন্য কোনো দক্ষতা শিখতে নিষেধ করছি না। শুধু সতর্ক করছি, আপনি নিজে যাতে ভালো, সেটাকে উপেক্ষা করে বা সেটার কদর না করে অন্য কিছু নিয়ে আচ্ছন্ন হয়ে থাকবেন না।

উকাজ বাজারে মুহাম্মাদ, ব্যবসায় ও জনমণ্ডলে নারীরা এবং বিদেশি সংখ্যালঘুরা আমাদেরকে মানুষের আসল শক্তি দেখায়। উদ্বেগের জায়গা নিয়ে মাথা নষ্ট না-করে, তারা যাতে ভালো সেটা নিয়ে কাজ করেছেন। হাতের কাছে সব উপায় উপকরণ থাকুক কী না-থাকুক, সমাজের সাহায্য পান কী না-পান, যেখানেই থাকুন নিজেকে মেলে ধরার চেষ্টা করুন। নিজের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র ধরে রাখুন।

অর্থনীতি

কৃষিকাজের জন্য মক্কার আবহাওয়া ছিল বৈরি। সেই সময়ে সেখানকার অর্থনীতি পুরোটাই ছিল বাণিজ্যনির্ভর। তৎকালীন দুই অর্থনৈতিক পরাশক্তি ইয়েমেন আর সিরিয়া ছিল মক্কার দুপাশে। অর্থনীতি চাঙা রাখতে তারা এর ভালো ব্যবহার করেছিল।

দেশিবিদেশি নানারকম পণ্য মক্কায় যেত। ভারত, মিশর, সিরিয়া, পারস্য ও ইয়েমেন থেকে পারফিউম, অলংকার, পোশাক, খাবার আমদানি করা হতো। সিরিয়া ও ইয়েমেনে বছরে গড়ে সাত সাতটা বাণিজ্য কাফেলা যেত। আরবের বাজারে এসব পণ্যের বিপুল চাহিদা তারা জানত। হাটবাজার ও হজ্জের মৌসুমে তাই এগুলো পাওয়ার সুব্যবস্থা করত।

ব্যবসায়ী হিসেবে কুরাইশদের তীক্ষ্ণ বিচারবুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায় আমর ইবনুল আসের ঘটনায়। মুসলিম শরণার্থীরা ইথিয়োপিয়াতে গিয়েছিলেন। তাদেরকে সেখান থেকে বহিষ্কার করার জন্য কুরাইশ মূর্তিপূজারীরা তাকে পাঠিয়েছিলেন বনিবনা করার জন্য। তিনি উপহার হিসেবে পোড়ানো চামড়া নিয়ে গিয়েছিলেন। ঝানু ব্যবসায়ী হিসেবে তিনি জানতেন চামড়ার ব্যাপারে ইথিয়োপিয়ানদের দুর্বলতা।

ইরাক আর সিরিয়া থেকে মালামাল নিয়ে মক্কার ব্যবসায়ীরা নিয়মিত ইথিয়োপিয়া যাতায়াত করতেন। ফিরে আসতেন ইথিয়োপিয়ান পণ্যসামগ্রী নিয়ে। ব্যবসা খাতে সরাসরি অনেকে কাজ করতেন। নারীরা বা যারা বয়সের কারণে পারতেন না, তারা টাকা বিনিয়োগ করতেন। বা তাদের পক্ষে মালামাল বিক্রির জন্য অন্যদের ভাড়ায় খাটাতেন।

তো এই ছিল মক্কার অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। আমরা একটু-আধটু দেখেছি মক্কার লোকজনদের মনমানসিকতা। দেখেছি কীভাবে সেখানকার নারী ও

বিদেশিরা প্রতিকূল পরিবেশে সফল হয়েছিলেন। আমি এখন মক্কার বাজারের ভেতরে ঢুকব। দেখব সেখানে রাসূল ﷺ কী করতেন। আমরা খুব বেশি ভেতরে ঢুকব না। শুধু দেখার চেষ্টা করব, যে পরিবেশে তিনি জীবনযাপন করেছিলেন সেটা। আমার উদ্দেশ্য, পরিবেশের ভেতর ডুবে না-যেয়েও বা নিজের স্বাতন্ত্র না। হারিয়েও আপনি যে তার মনিব হতে পারেন সেটা দেখানো।

বাজার

পর্যটনশিল্প আজকের জমানায় একটি দেশের অন্যতম আয়ের উৎস। মক্কায় সেটা ছিল হজ্জের মৌসুম। আরবদের কেনাকাটার ব্যাপারও ছিল। মক্কার প্রধান মার্কেটগুলো কোনো এক জায়গায় নির্দিষ্ট ছিল না। বিভিন্ন দিনে বিভিন্ন জায়গায় বসত। নামকরা মার্কেটগুলোর মধ্যে ছিল মিজানা, যুল-মিজাজ, উকাজ।

সুক উকাজ মক্কার সবচেয়ে প্রসিদ্ধ মার্কেট। সুক মানে বাজার বা মার্কেট। সেটা শুধু মার্কেটই ছিল না। এটা ছিল বার্ষিক উৎসব। এখানে কবিতা পাঠের আসর বসত। অ্যাথলেটিকরা তাদের ক্রীড়ানৈপুণ্য দেখাত। দেশিবিদেশি পণ্যের পসরা বসত।

সুক উকাজের সোনালি সময়টাতেই কিন্তু রাসূল ﷺ ওখানে কাটিয়েছেন। সেখান থেকে কেনাকাটা করেছেন। কিন্তু এর নোংরামি থেকে দূরে ছিলেন। পৃথিবীর অন্যান্য অনেক জাঁকজমকপূর্ণ মার্কেটের মতো এখানেও জুয়া, পতিতালয়সহ অন্যান্য অশ্লীল কাজের আখরা বসত।

রাসূল ﷺ বেশ স্মার্ট ছিলেন। তিনি শুধু তার ব্যবসা করতেন। এসব ঝামেলা থেকে দূরে থাকতেন। সপ্তম শতকের আরবের বাজারে প্রতিদিনকার একটা চিত্রের বর্ণনা দিচ্ছি-

সুক উকাজ

কী হতো না সেখানে? কেনাবেচা, কবিতা প্রতিযোগিতা, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, বিভিন্ন গোষ্ঠীর দান-খয়রাতমূলক কাজসহ কত কী। তারা গরিবদের খাওয়াত। ভিখারিদের ভিক্ষা দিত। মুক্তিপণ দিত। বন্দীদের মুক্ত করত। বিবাদ মীমাংসা, সন্ধিচুক্তি এগুলোও হতো।

মক্কা, তায়েফ, মদিনা থেকে বিভিন্ন গোষ্ঠী ভিড় করত। বাহরাইন, উমান, ইয়েমেন, সিরিয়া, ইরাকের মতো দূরদূরান্ত থেকেও লোকজন আসত। মার্কেটের সীমানার বাইরে তাদের তাঁবু টাঙাত। প্রত্যেক গোষ্ঠী তাঁবুর সামনে তাদের ব্যানার ঝুলিয়ে রাখত। তারা তাদের সাথে পণ্যসামগ্রী নিয়ে আসত বেচার জন্য। প্রত্যেক গোষ্ঠী তাদের সবচেয়ে প্রতিভাধর কবিকে নিয়ে আসত। তাদের কাজ ছিল নিজ নিজ গোষ্ঠীর স্তুতি করা।

নোংরামিও চলত পাল্লা দিয়ে। শারীরিকভাবে উত্যক্ত করা, হয়রানি করা নিয়ে কখনো কখনো গোলাযোগ বেধে যেত। জুয়া আর পতিতাবৃত্তির আখড়া ছিল অগণিত। শহরে প্রথমবারের মতো আসা বড় বড় চোখের বেদুইন ছেলেদের তারা আকৃষ্ট করার চেষ্টা করত। চুরিচামারি, ধোঁকাবাজি, সুযোগ গ্রহণের মতো বিষয় তো ছিলই।[৪]

বাজারে রাসূল ﷺ

সময়ের ঘড়িতে চড়ে আপনি যদি সেই সময়ের সুক উকাজে যেতে পারতেন, তাহলে অবাক করা কিছু ব্যাপারস্যাপার দেখতেন। সে সময়ের জন্য অবশ্য সেগুলো স্বাভাবিক ছিল। নারীরা তো বোরকা পরতই, অনেক পুরুষেরাও তাদের মুখ ঢেকে চলত।

অনেকে বলেন, তারা তাদের সুদর্শন চেহারা ঢাকার জন্য এমনটা করতেন। তবে সবার ব্যাপারে এমনটা হওয়া সংগত না। কেউ কেউ বলেন, তাদের ঘিরে রহস্যের জাল বোনার জন্য এমন করতেন। তবে যে কারণটা বেশি বাস্তবসম্মত তা হলো, তাদের যাতে চেনা না-যায়। নাহলে প্রতিদ্বন্দ্বী গোষ্ঠী মুক্তিপণ আদায়ের জন্য তাদের অপহরণ করতে পারে।

আপনি হয়ত দেখতেন লোকজন এক জায়গায় জড়ো হয়ে গল্পগুজব করছে। কিচ্ছাকাহিনি রটাচ্ছে। কোনো গণক তির ছুড়ে হ্যাঁ-না'র মাধ্যমে কোনো কাজের ভবিষ্যত নির্ধারণ করছেন। আজকের যুগের ম্যাজিক এইট বলের মতো।

মানুষ, পণ্য আর কাজকর্মের এক রঙিন আনন্দবাজার ছিল সুক উকাজ।

রাসূল ﷺ মক্কার মার্কেটের এ রকম রমরমা সময়েই জীবনযাপন করেছেন। ব্যবসা করেছেন। কিন্তু ভালো-খারাপ আলাদা করে চলার মতো বোধবুদ্ধি তাঁর ছিল।

দেখে যদিও মনে হতো বাজারে সবাই বুঝি নোংরামিতে গা ভাসিয়ে দিয়েছে, রাসূল ﷺ কিন্তু বিচক্ষণতার সাথে তা এড়িয়ে চলতেন। নিজের মূলনীতি ও বিশ্বাস দিয়ে সমাজের কাজকর্ম যাচাই করতেন। সমাজ কোনোকিছুকে ভালো চোখে দেখে বলে অন্ধের মতো তিনি তা গ্রহণ করেননি। খারাপ জানলে ঠিকই এড়িয়ে যেতেন।

মার্কেটে রাসূল ﷺ জিনিসপত্র বেচেছেন। কিনেছেন। এর বাইরে নিজের জীবন ও স্রষ্টার ব্যাপারে ভাবনা জাগানো বিষয়ে আগ্রহী ছিলেন।

হাদিস থেকে জানা যায়, রাসূল ﷺ-এর বয়স যখন বিশ, তখন সুক উকাজে কিস্ ইব্ন সাদারের বিখ্যাত এক ভাষণ শোনেন। তিনি মানুষদের সতর্ক করে দিচ্ছিলেন যে, মানুষগুলো আল্লাহর ব্যাপারে বেখেয়াল। আশপাশের মানুষগুলো অযথা ঘুরঘুর করছিল। কিন্তু তিনি মন দিয়ে তার কথা শুনেছেন। এ থেকে ধর্মের ব্যাপারে তার আদি উৎসাহের ধারণা পাওয়া যায়।

কিস্ তার ভাষণে যা বলেছেন তা নিম্নরূপ-

> 'যারা একদিন বেঁচে ছিল, তারা আজ মারা গেছে। আর যারা মারা গেছে তাদের সব সুযোগ শেষ...। মানুষজন কি ভেবেছে দুনিয়াতে এসে আর ফিরে যাবে না? তারা কি তাদের কবর নিয়ে খুব খুশি? তারা কি সেখানেই থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে? নাকি সেখানে তাদেরকে ঘুমানোর জন্য রেখে দেওয়া হয়েছে? চুলোয় যাক খামখেয়ালি শাসক, পরিত্যাক্ত জাতি আর কালের খাতায় হারিয়ে যাওয়া শতাব্দী...। যারা উঁচু উঁচু অট্টালিকা বানিয়েছিল আজ তারা কোথায়? যারা সাজিয়েছিল, আরামের ব্যবস্থা করেছিল তারা আজ কোথায়...? তারা তোমাদের চেয়ে বড়লোক ছিল না? বেশিদিন জীবিত ছিল না...? এখন তাদের হাড্ডি ক্ষয় হয়ে গেছে। তাদের ঘরবাড়িগুলো পরিত্যক্ত। বেওয়ারিশ কুকুর এখন সেখানে থাকে। কেবল মহান আল্লাহ চিরঞ্জীবী। তিনি একজনই। শুধু তিনি উপাসনা পাওয়ার অধিকারী। তাঁর কোনো বাবা-মা নেই। বাচ্চাকাচ্চাও নেই'।

এই কথা শোনারও আরও বিশ বছর পর রাসূল ﷺ নবিত্বের দায়িত্ব পান। কিন্তু তখনো এই কথাগুলো তাঁর মাথায় ছিল। এই কথার এত গুরুত্ব কী? বিশ বছর বয়সী এক তরুণের জন্য বাজারের নানা প্রলোভন ছেড়ে এ ধরনের বক্তব্য শোনা কি ব্যতিক্রম না? সমাজের দোহাই দিয়ে রাসূল কি গা ভাসিয়ে দিয়েছিলেন? তিনি কি ভালোটা বেছে নেননি? আমরা যারা প্রতিকূল সমাজে থাকি, যেখানে সবসময় খারাপ পথের ডাক, সেখানে থেকেও কীভাবে সঠিকটা বেছে নিতে পারি, সে ব্যাপারে এই ঘটনা থেকে আমরা অনেক উপকার নিতে পারি। তরুণ ভাইবোনেরা খেয়াল করছেন তো?

প্রভাব বলয়

আমাদের পরিবেশ-পরিস্থিতি নিয়ে ঘ্যানঘ্যান না-করে আমাদের প্রভাব বলয় বাড়ানোর ব্যাপারে কাজ করা উচিত। উদ্বিগ্ন বলয় হচ্ছে, সেসব সমস্যা যেগুলো আমাদের উদ্বিগ্ন করে। যেমন- নীতিবোধ বিসর্জন, অন্যান্য লোকদের আচারআচরণ। প্রভাব বলয় হচ্ছে, যা আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি।

আমরা হয়ত অন্যের আচার-আচরণ না-ও বদলাতে পারি। কিন্তু আমরা নিজেদের নিয়ে তো ভাবতে পারি? নিজেদের নিয়ে আরও সক্রিয় ভূমিকা তো পালন করতে পারি?

রাসূল ﷺ-এর বেলায় কী হয়েছিল দেখুন। সুক উকাজে কেউ লেকচার শুনতে আসত না। কিস্ ইব্ন্ সাদ্রের কথা মাথায় রাখা তো দূরের কথা, শুনতেই বা কজন দাঁড়াত! আর বাজারের যা পরিবেশ ছিল, তাতে ওদিকে কারও খেয়ালও হতো না। সম্পূর্ণ ভিন্ন উদ্দেশ্যে লোকজন বাজারে আসত। (কিসের ভাষায় 'বেখেয়াল'।) অন্যান্য তরুণেরা যেখানে বাজারের নোংরামিতে ঢলে পড়েছিল, রাসূল ﷺ সেখানে বাজারের মধ্যে দাঁড়িয়ে তার বক্তব্য শুনেছেন। জ্ঞান খুঁজেছেন। তিনি সেই সমাজ থেকে সরে পড়েননি। কিন্তু খারাপ পথ থেকে ঠিকই দূরে থেকেছেন। অন্যান্য তরুণদের মতো না।

মূর্তিপূজা

ষষ্ঠ শতকে আরব উপদ্বীপে বহু ধর্মীয় বিশ্বাসের অস্তিত্ব ছিল। মূর্তিপূজা বা বহু ঈশ্বরে বিশ্বাস ছিল অন্যতম। আরবের এই বহু ঈশ্বরে বিশ্বাসের ধরন আজ আর নেই। যে কারণে এটা বুঝতে অনেকের সমস্যা হয় আজ।

মক্কার মূর্তিপূজারিরা আল্লাহকে বিশ্বাস করত বটে। কিন্তু তাঁর সাথে অন্য অনেক কিছুকে পবিত্র মনে করে পূজা করত। যেমন- সূর্য। লোকজন সূর্যের সামনে মাথা নোয়াত। ছেলেপেলের নামও রাখত আবদুশ শাম্‌স্‌ অর্থাৎ, সূর্যদাস। যারা ফেরেশতা বা অ্যাঞ্জেলদের পূজা করত, তারা ভাবত এরা আল্লাহর মেয়ে। মানে তারা আল্লাহর ইবাদত করত। তবে সাথে সাথে অন্যান্য বস্তু বা দেবদেবীকে আরাধনার তুল্য মনে করত।

এই অধ্যায়ের বাকি অংশে আমরা কথা বলব ষষ্ঠ শতকের শেষ ও সপ্তম শতকের শুরুর দিকে মক্কার ধর্মীয় বিশ্বাস নিয়ে। মূর্তিপূজারিদের মাঝে কিছু লোক এমনও ছিল যারা শুধু আল্লাহর উপাসনা করত। এদের পরিচয় ছিল 'হানিফ'। সমাজের বেশিরভাগের লোকের বিশ্বাসের চেয়ে এদের বিশ্বাস আলাদা ছিল। আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে, এমন বিরূপ পরিবেশে থেকেও রাসূল ﷺ কীভাবে তাঁর প্রভাব বলয় বাড়াতে পেরেছিলেন। নিজের ব্যাপারে ভেবেছিলেন সেটা দেখা।

আল্লাহর উপাসনাকারীরা

মক্কার সবাই বহুদেবদেবীর পূজারি ছিল না। ওখানে কিছু ইহুদি, খ্রিষ্টান, মানদাইন (আজকেও এদের অস্তিত্ব আছে। বড়জোড় এদের সংখ্যা ষাট থেকে সত্তর হাজার। মূলত উত্তর ইরাকে থাকলেও ২০০৩ সালের পর বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ে।) ও এক স্রষ্টায় বিশ্বাসীরা ছিল। এক স্রষ্টায় বিশ্বাসীদের মধ্যে বিশ্বাসের ধরনে তারতম্য ছিল। তবে তারা সবাই বিশ্বাস করত যে, নবি ইবরাহীম আলাইহিস-সালাম কাবাঘর তৈরি করেছেন। আর তিনি আল্লাহর দাসত্ব করতেন। ইবরাহীম নবি কীভাবে আল্লাহর উপাসনা করতেন তা নিয়ে অবশ্য তারা একমত ছিলেন না। সম্ভবত তারা বিষয়টা ভালোভাবে জানতেন না। এদের কেউ কেউ ইহুদি বা খ্রিষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেন। ইসলামিক ইতিহাসবিগণ এদেরকে 'আহনাফ' নাম দিয়েছেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন- ওয়ারাকা ইবনে নাওফাল বড় জ্ঞানী ব্যক্তি। হিব্রু ভাষা ও ধর্মীয় ইতিহাস সম্পর্কেও জানতেন। যাইদ আমর মক্কার সমাজের সমালোচনা করতেন। তার ধর্মবিশ্বাসের কারণে তাকে হয়রানির শিকার হতে হয়েছে। হানিফরা সংখ্যায় ছিল খুব কম। তারপরও তারা তাদের বিশ্বাস ধরে রাখতে পেরেছিলেন।

দেখেন, তারা যে সমাজে ছিল সেখানে এ ধরনের বিশ্বাস ছিল উদ্ভট। অপমানের ব্যাপার তো আছেই। সমাজে যার চলন ছিল অন্ধের মতো, তারা তা অনুকরণ করেননি। নিজের বিশ্বাস দিয়ে তারা তাদের মূলনীতি গঠন করেছিলেন। তাতে অটল ছিলেন। আমাদেরও উচিত আমাদের বিবেকবুদ্ধি দিয়ে নিজের জন্য চিন্তাভাবনা করা।

নিজের পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ

সে সময়কার মক্কার ব্যাপারে বলতে গেলে আরও অনেক কিছু বলা যায়। তবে আমরা এখানে সাধারণভাবে সমাজের একটা রূপ তুলে ধরেছি। সমাজের এ অবস্থাতেই রাসূল বড় হয়েছেন। তবে সমাজ তাঁকে প্রভাবিত করতে পারেনি; বরং তিনি তাঁর পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন।

প্রকৃতি বনাম পরিচর্যা

পরের অধ্যায়ে আমি রাসূল ﷺ-এর পরিবারের বাড়তি সদস্যদের ভূমিকা নিয়ে কথা বলব। কীভাবে তারা রাসূলের অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করেছিলেন সেটা নিয়ে বলব। তবে এ অধ্যায়ে একটা বিশেষ দিকের কথা বলে শেষ করাটা গুরুত্বপূর্ণ মনে করছি।

প্রকৃতি বনাম পরিচর্যার বিতর্ক শতকের পর শতক ধরে চলে আসছে। কোনো সমাধান হয়নি। মানুষের বিকাশে প্রকৃতিই সব নাকি তার পরিচর্যা। এটা নিয়ে যত বিতর্ক। তবে আমার কাছে এর সবচেয়ে বাস্তবভিত্তিক সমাধান হচ্ছে, আমাদের পরিবেশ বা জিন কোনোটাই না। আমি নিজেই।

আপনার পরিবেশ, আপনার আশেপাশের লোকজনদের সাথে আপনার ব্যবহার কেমন হবে সেটা আপনারই হাতে। আপনার পরিবেশ ও জিন গুরুত্বপূর্ণ। তবে বিষয়টাকে এমন ভেবে ভুল করবেন না যে, নিজের গতিপথ নির্ধারণে আমার কোনো ক্ষমতাই নেই।

এই অধ্যায়ে আমরা দেখেছি মানুষের বাস্তবজীবনের অভিজ্ঞতা। অনেকে তাদের পরিবেশের ওপর কর্তৃত্ব করেছিলেন। অনেকে মুখোমুখি হয়েছেন

কঠিন সব পরিস্থিতি ও অসহায়ক পরিবেশের। তারা এসব প্রতিবন্ধকতাকে মাড়িয়ে সমাজে জায়গা করে নিয়েছিলেন। নিচের টেবিলে এসব অনুপ্রেরণামূলক উদাহরণগুলো আবার স্মরণ করিয়ে দেওয়া হলো :

রাসূল ﷺ-এর পরিবেশ থেকে আমাদের কী লাভ	
রাসূল ﷺ-এর পরিবেশ	**আপনার পরিবেশ**
তাঁর চারপাশে অনেক প্রলোভন ছিল। তবে ভালো কিছু বিকল্পও ছিল। যেমন : বাজারে কিস ইবন সাদা'র মন নাড়িয়ে দেওয়া লেকচার।	নিজের চারপাশ নিয়ে অভিযোগ করবেন না। আপনার উচ্চাকাঙ্ক্ষার সাথে উপযোগী সুযোগ ও বিকল্প খুঁজুন। এরপর নিজেকে বিকশিত করুন।
বহু দেব-দেবীর পূজো করার জন্য সেই সমাজে বহু চাপ ছিল। কিন্তু তারপরও এক আল্লাহর উপাসনাকারীরা সেই চাপ প্রতিরোধ করতে পেরেছিলেন।	সমাজে সবাই কিছু একটা করছে, বা সেটাই প্রবল এই ভেবে সেগুলো অনুসরণ করতে যাবেন না। নিজের বিশ্বাস প্রত্যয় প্রকাশের চেষ্টা করুন
রাসূল ﷺ-এর আরবসমাজে অনারবদের নিচু চোখে দেখা হতো। কিন্তু তারপরও কেউ কেউ তাদের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার গুণে সফল হয়েছিলেন।	সংখ্যালঘু হলেও আপনি আপনার প্রতিভা ও দক্ষতা নিয়ে আত্মবিশ্বাসী থাকুন। দেখবেন যে এজন্য সংখ্যাগরিষ্ঠরা একদিন আপনাকে সম্মান করছে।
রাসূল ﷺ-এর আরবসমাজ প্রচণ্ড নারীবিরোধী ছিল। তারপরও কেউ কেউ বিশেষ জায়গা করে নিয়েছিলেন।	নিজের প্রতিভার প্রকাশ ঘটান। যদিও সমাজ আপনাকে যথেষ্ট সহযোগিতা না-করে বা উৎসাহ না দেয়।

মুহাম্মাদ ﷺ-এর কৈশোর

টিনএজ বয়সটা বেশিরভাগের জন্য বিব্রতকার। এ বয়সের ছেলেমেয়েদেরকে অনেক সমস্যায় পড়তে হয়। শৈশব থেকে কৈশোরে পা দেওয়াটা প্রাকৃতিক ব্যাপার হলেও বেশিরভাগের ক্ষেত্রে এই পদার্পণ মসৃণ হয় না। টিনএজ বয়সীদের সবকিছু নেতিবাচক না। তাদের ভালোভাবে দেখাশোনা করলে, তাদের ওপর আস্থা রাখলে, তাদের আচারআচরণও ভালো হবে। তারা দায়িত্ব নিয়ে কাজ করবে। মা'র মৃত্যুর পর রাসূল ﷺ ২৫ বছর বয়স পর্যন্ত চাচার সাথে ছিলেন। চাচা তাঁকে ভালোবাসতেন। স্নেহ করতেন। এ বয়সে যদি তাদেরকে ঠিকমতো বড় করে তোলা হয়, তাহলে বাবা-মা'র অনুপস্থিতিতেও তারা বিপথে যাবে না। দায়িত্বশীলভাবে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করবে।

আস্থাভাজন হোন

অনেকের কাছে কৈশোরের বয়সটা বিব্রতকর। স্পর্শকাতর। এই অধ্যায়ের শিরোণাম দেখে কেউ কেউ ভ্রু কুঁচকাতে পারেন। রাসূল ﷺ-ও টিনএজ বয়স পার করেছেন?

যা হোক, শৈশব থেকে কৈশোরে পা দেওয়াটা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ এই ধাপ পার করেছেন। এটা নিয়ে বিব্রত হওয়ার কিছু নেই।

টিনএজ বয়সে ছেলেমেয়েদের মধ্যে নানারকম হরমোনজনিত পরিবর্তন দেখা দেয়। এর ফলে তার আচারআচরণ, কথাবার্তায় পরিবর্তন আসে। সব পরিবর্তনই খারাপ না। পরিবর্তনগুলো তাদের আশপাশ ও ব্যক্তিত্ব থেকে উঠে আসে।

চ্যালেঞ্জটা কৈশোরের না। সে কোন পরিবেশে মানুষ হচ্ছে সেটা। স্বাভাবিকভাবে তারা অস্থির না; বরং খুব আবেগী। এজন্য বুদ্ধি করে তাদের সাথে চলতে হবে।

আগের অধ্যায়ে আমরা রাসূল ﷺ-এর পরিবারের বাড়তি সদস্যদের ভূমিকা দেখেছি। এখানে দেখব কিশোর বয়সে ঘরে বাইরে তাঁর জীবন প্রণালি কেমন ছিল। আমার লক্ষ্য টিনএজ বয়সীদের আত্মবিশ্বাস মজবুত করা। অন্যান্যরাও যেন বুঝেন যে, যেসব পরিবেশে ভালোবাসা আছে, পারস্পরিক শ্রদ্ধাপূর্ণ সম্পর্ক আছে, যেখানে কিশোরদের আগ্রহকে খাটো চোখে দেখা হয় না, সেখানে তারাও ইতিবাচক অবদান রাখতে পারে।

টিনএজ

একেক সংস্কৃতিতে কিশোর বয়সের সংজ্ঞা আলাদা। এক দেশে যে বয়সে কাউকে কিশোর ধরা হয়, অন্য দেশে তা হয় না। কোথাও আগে, কোথাও পরে। এই অধ্যায়ে আমরা শুধু রাসূল ﷺ-এর কিশোর বয়স নিয়ে কথা বলব।

কোনো কোনো মুসলিম পাঠক হয়ত বলবেন, 'রাসূল ﷺ-এর-কে তো আল্লাহ নিজে হেফাজত করেছেন। কিশোর বয়সের সমস্যাগুলো তাঁকে আমাদের মতো ফেস করতে হয়নি'।

রাসূলকে অবশ্যই মহান আল্লাহ সুরক্ষা করেছেন। তবে সেটা তাঁর মানবীয় গুণাবলির মধ্য থেকেই। আর মহান আল্লাহ এমন কিছু উপায়ে তা করেছেন, যা থেকে কিশোর ছেলেমেয়েদের বড় করার বেলায় যেকোনো বাবা-মা উপকৃত হতে পারেন।

মহান আল্লাহ তায়ালা কাজ করেছেন মানুষদের মাধ্যমে। তারা ভালোবেসে টিনএজ রাসূল ﷺ-কে পালন করেছেন। এমন পরিবেশ দিয়েছেন যেখানে তিনি তাঁর কর্মশক্তির সুব্যবহার করতে পেরেছিলেন। আমরাও এমনটা করতে পারি।

রাসূল ﷺ খুব অসাধারণ জীবন কাটিয়েছেন। এমন কথা যেন আমাদের হতোদ্যম না-করে; বরং এটা যেন আমাদের জন্য অনুপ্রেরণা হয়। নইলে রাসূলের কাহিনি মানুষের মনে শুধু সমীহ জাগাবে। ভক্তি বাড়াবে। কিন্তু নিজেদের উন্নতির জন্য কীভাবে তাঁর জীবনকে আমরা বাস্তব উদাহরণ হিসেবে ব্যবহার করতে পারি, তা উপলব্ধি করতে পারব না।

ঘরে ভালোবাসা ও সম্মান

চাচা আবু তালিবের ঘরে মোট সদস্য সংখ্যা ছিল আটজন। আবু তালিব, তার স্ত্রী ফাতিমা বিনতে আসাদ। তাদের সন্তান জাফর, জুমানা, ফাখিতা, আকিল, আলী ও তালিব। তাদের ঘরবাড়ির আকার, কতগুলো রুম ছিল, কেমন আসবাবপত্র ছিল- সে ব্যাপারে কিছু জানি যায় না। তবে ঐতিহাসিকগণ বলেন, তাদের পরিবারের হাল-হাকিকত খুব একটা ভালো ছিল না। আর্থিক সমস্যার কারণে পরিবারে মাঝে মাঝে বিবাদ হতো। তবে পরিবারের পরিবেশ স্থিতিশীল ছিল। কিশোর বয়সের জন্য এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সবার মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া ভালো ছিল। একে অপরের কদর করত।

এই সময়ে আল্লাহ তায়ালা কীভাবে তাঁকে সুরক্ষা করেছেন, সে ব্যাপারে তিনি বলেন,

> 'তিনি কি তোমাকে এতিম অবস্থায় পেয়ে আশ্রয় দেননি'? আদ দ্বোহা : ৬

আশ্রয় বলতে এখানে শুধু মাথা গোঁজার ঠাঁইয়ের কথা বলা হয়নি; বরং স্থিতিশীল পরিবার এবং যে পরিবার টিনএজদের ভালোবাসা ও সম্মানের প্রয়োজন মেটায় তার কথাও বলা হয়েছে।

অসংখ্য গবেষণায় পাওয়া গেছে, স্থিতিশীল পরিবারে বেড়ে উঠলে শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্য ভালো হয়। স্কুলে এদের পারফরম্যান্স ভালো হয়। ড্রাগ ব্যবহার বা আত্মহত্যার মতো সমস্যাগুলোতে পড়ার আশঙ্কা কম হয়।

স্থিতিশীলতা ও বোঝাপড়ার সাথে ভালোবাসা ও স্নেহও থাকতে হবে। রাসূল ﷺ তাঁর কিশোর বয়সে এর সবই পেয়েছিলেন।

আবু তালিব যে কিশোর মুহাম্মাদকে কতটা ভালোবাসতেন তার কিছু নমুনা দিই।

- সবাই একসাথে খাওয়ার আগে তার জন্য অপেক্ষা করত।
- তাঁর কাছাকাছি ঘুমাতেন।
- সফরে বা কোথাও গেলে তাঁকে নিয়ে যেতেন।

যে ঘরে সাত সাতটা বাচ্চা থাকে, সে ঘর- হয় জান্নাত নয় জাহান্নাম। আবু তালিবের স্ত্রী ফাতিমা এক্ষেত্রে বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। চিরায়ত জীবনীগ্রন্থগুলোতে তার ব্যাপারে খুব একটা কথা পাওয়া যায় না। রাসূলের সাথে তার সম্পর্ক কেমন ছিল তার কমই জানি। মা হিসেবে তিনি কিন্তু চমৎকার ছিলেন। রাসূল তো এ ঘরে বড় হয়েছেনই, আলী আর জাফরের মতো গুরুত্বপূর্ণ ইসলামি ব্যক্তিত্বরাও কিন্তু এ ঘরেই মানুষ হয়েছেন। চাচীর ব্যাপারে রাসূল একবার বলেছিলেন, 'চাচার পর চাচীর মতো আর কেউ আমার প্রতি এত দরদি ছিলেন না'। খাদিজা (রা)-এর সাথে বিয়ে হওয়ার আগ পর্যন্ত রাসূল ﷺ এ বাড়িতে ছিলেন। প্রায় সতের বছর। এ বাসা ছেড়ে দেওয়ার পরও চাচীর সাথে তার সম্পর্ক কমেনি; বরং বেড়েছে।

আবু তালিবের মৃত্যুর পর চাচী ফাতিমা বিনতে আসাদ ইসলাম কবুল করেন। এরপর তার ছেলে আলী ও বউমা ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহুমার কাছে চলে আসেন। ছোট থাকতে রাসূলকে চাচী যেভাবে যত্নআত্তি করেছেন, নবিকন্যা ফাতিমা (রা)ও তার শাশুড়িকে সেভাবে যত্নআত্তি করেছেন। দুজন ফাতিমার মধ্যে গুলিয়ে ফেলবেন না। ফাতিমা বিনতে আসাদ রাসূলের চাচী। আর ফাতিমা বিনতে মুহাম্মাদ রাসূল ﷺ-এর কন্যা।

মদিনায় মৃত্যুর আগপর্যন্ত চাচীর কাছাকাছি ছিলেন রাসূল। তার মৃত্যুর পর তিনি নিজ হাতে তার কবর খুঁড়েছেন তার প্রতি ভালোবাসার নিদর্শন হিসেবে। তার জন্য দোয়া করেছেন।

আপনিও আপনার টিনএজ ছেলেমেয়েদের সাথে মজবুত সম্পর্ক গড়ুন, যে সম্পর্ক দিনদিন শুধু বাড়বেই।

কিশোরদের সমর্থন দরকার

কিশোরদের জন্য বয়সটা শঙ্কুল। তাই পরিবারের উচিত সবধরনের সহায়তা করা। আদর-যত্ন ভালোবাসা দেওয়া। এগুলো ম্যাজিকের মতো কাজ করে, কারণ,

- ওরা মানুষের আকর্ষণ চায়। মূল্যায়ন চায়। আপনি সেটা দিচ্ছেন।
- ওদের আত্মবিশ্বাস বাড়ে।
- আত্মবিশ্বাসের সাথে ওরা দায়িত্ববান হয়।

প্রথমে মা, এরপর দাদি, তারপর চাচী- সবার কাছেই রাসূল ﷺ আদর ভালোবাসায় মানুষ হয়েছেন। বিনিময়ে তিনিও তাঁর চাচা-চাচীর ভালোবাসার প্রতিদান দিয়েছেন। চাচাকে সাহায্যের জন্য তিনি রাখাল হিসেবে কাজ করেছেন। চাচার মৃত্যু তাঁকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল। সেই একই বছরে তাঁর প্রাণপ্রিয় স্ত্রী খাদিজা (রা)ও মারা যান। সে বছরটা দুঃখের বছর নামে পরিচিত। চাচীর মৃত্যুতেও তিনি বিহ্বল হয়ে পড়েন। তিনি নিজ হাতে তাঁর কবর খুঁড়েছেন। মহান আল্লাহর কাছে তার মুক্তির জন্য দোয়া করেছেন।

আপনি কীভাবে টিনএজদের ভালোবাসবেন?

- তার অর্জনগুলো উৎযাপন করুন।
- তাকে বিচার না-করে বা বাধা না-দিয়ে তার কথা মন দিয়ে শুনুন।
- তাকে জানান যে, আপনি তাকে ভালোবাসেন, তার মূল্যায়ন করেন।

সম্মান

ভালোবাসার সাথে সম্মানও দরকার। রাসূল ﷺ-এর পরিবার তাকে সর্বোচ্চ সম্মান করত। এটা তার বিশুদ্ধ ব্যক্তিত্ব গঠনে সাহায্য করেছে। যে কারণে তিনি ছোট বয়স থেকেই দায়িত্বশীল আচরণ করেছেন। উনি কীভাবে দায়িত্বশীল আচরণ করেছেন, আর আপনি তা থেকে কী ফায়দা নিতে পারেন চলুন দেখি-

রাসূল ﷺ-এর ব্যবহার	আপনার আচরণ
রাসূল ﷺ তখন ১২ বছরের বালক। এক সন্ন্যাসী তাঁকে কিছু প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য শর্ত দিলেন লাত আর উয্যার কসম কাটতে। তিনি বললেন, 'লাত, উয্যার নামে আমাকে কিছু বলতে বলবেন না। আল্লাহর কসম, এদেরকে আমি সবচেয়ে ঘৃণা করি। এখন আপনি আপনার প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে পারেন'।	সংখ্যায় বেশি হলেই কারও মত অনুসরণের যোগ্য হয় না। রাসূল ﷺ-এর আশেপাশে বেশিরভাগই ছিল মূর্তিপূজারি। কিন্তু তিনি তা থেকে বের হয়ে এসেছিলেন। সুতরাং ভদ্রভাবে এবং অন্যের মতের প্রতি সম্মান রেখে নিজের বিশ্বাস প্রকাশ করুন।
চাচা-চাচী, চাচাতো ভাইবোনদের সাথে বসে ধীরে-সুস্থে খাবার খেতেন। গোগ্রাসে গিলতেন না। খাওয়া শেষ করেই হুটহাট উঠে যেতেন না।	কোনো কিছু নিয়ে অধৈর্য হবেন না। পীড়াপীড়ি করবেন না। ধৈর্য ধরুন। কিছু চাইতে হলে সুন্দর করে সম্মান রেখে চান।
ঘুম থেকে উঠে ঘুমকাতুরে চোখ আর উস্কুখুস্কু হয়ে তিনি বের হতেন না। অন্যান্যদের সাথে দেখা করার আগে চোখমুখ ধুতেন। চুল আঁচড়াতেন।	ঘরে পরিবারের ভেতরেও নিজের অ্যাপিয়ারেন্সের খেয়াল রাখুন।

মানুষের সাথে ভালো ব্যবহার নিয়ে আবু তালিবের সুনাম ছিল। মক্কাবাসী তাকে বেশ শ্রদ্ধা করত। যদিও তার আর্থিক অবস্থা ভালো ছিল না। আর গরিবদেরও সে সমাজে খুব একটা সম্মানের চোখে দেখা হতো না। আদি আরব ঘটনাপঞ্জিতে আছে, আবু তালিব আর উতবা ছাড়া গরিব কুরাইশদের মধ্যে কেউ শক্তিশালী ছিল না। টাকাপয়সা ছাড়াই এরা ক্ষমতাশালী হয়।

আবু তালিবের আবির্ভাব ছিল নিয়মের ব্যতিক্রম। তার নিষ্কলুষ নৈতিকতার কারণেই এমনটা হয়েছে। তার স্ত্রী, ছয় সন্তান এবং ভাতিজা মুহাম্মাদ ﷺ-এর সাথে আচরণে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। টিনএজারদের জন্য শ্রদ্ধাপূর্ণ ব্যবহার খুব

গুরুত্বপূর্ণ। রাসূল ﷺ যে এমন একটা পরিবেশ পেয়েছেন, তার কারণ আবু তালিব ব্যক্তি হিসেবে এমনই ছিলেন। তিনি রাসূল ﷺ-কে কখনো মারধোর করেছেন, গালিবকা দিয়েছেন বা কাউকে নিয়ে ঠাট্টা করেছেন- এমনটা কল্পনা করা কঠিন। তার মতো সম্মানিত একজন ব্যক্তির পক্ষে এসব বেমানান।

একবার ভেবে দেখেন, এই চাচার বাসায় বড় না হয়ে তিনি যদি চাচা আবু লাহাবের ঘরে বড় হতেন, তাহলে কি তিনি একই আচরণ পেতেন? টিনএজ ছেলেমেয়ে ঘরে কতটা সম্মান পাবে, সেটা তার নিজের চেয়ে বেশি নির্ভর করে কারা তার দেখাশোনা করছে তার ওপর। চলুন দেখি, আবু তালিব কীভাবে রাসূল ﷺ-এর এই বয়সটা ব্যবহার করেছেন, আর আপনি তা থেকে কী ফায়দা নিতে পারেন

কিশোর রাসূল ﷺ-এর সাথে আবু তালিব

তিনি যখন দেখলেন অন্যান্যদের মতো মুহাম্মাদ এক বসায় সব গোগ্রাসে গেলে না, তখন তিনি নিজে তাঁর জন্য আলাদা করে খাবার রেখে দিতেন। খাবারে বসার সময় তিনি তাঁকে সাথে নিয়ে বসতেন। বলতেন, 'তুমি আমাদের জন্য বারকাত'। রাসূল বসা না-পর্যন্ত তিনি ও তার পরিবারকে খাওয়া শুরু না-করতে বলতেন।

আপনার টিনএজের সাথে আপনার ব্যবহার

টিনএজদের পার্থক্যগুলো সম্মান করুন। তার ব্যক্তিত্বের জন্য সঠিক পরিবেশ দিন, কারণ তার নিজস্ব প্রয়োজন থাকতে পারে। এতে করে ছোটখাটো কলহের পরিমাণ কমবে। তাদের বিকাশে সহায়ক পরিবেশ তৈরি করবে। আপনার টিনএজ সন্তানের কদর বুঝুন। তাকে বলুন আপনি তার নৈপুণ্য আর দক্ষতায় কত খুশি। এটা তার আত্মবিশ্বাস গড়ে দেবে।

টিনএজ বয়সীদের কীভাবে সম্মান দেখাবেন

- ভুল করলে তাদের কাছে দুঃখ প্রকাশ করুন।
- তাদের ব্যক্তিত্ব বিকৃত না-করে আচরণ বদলানোর চেষ্টা করুন।
- মন দিয়ে তাদের কথা শুনুন, কথার মাঝখানে বাগড়া দেবেন না।
- তাদের অপমান করবেন না। অন্যের সামনে গালিগালাজ, বকাবকি করবেন না।

কিশোর-কিশোরীদের প্রতিভা ও সম্ভাবনায় বিশ্বাস রাখা ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার অন্যতম অংশ। আবু তালিব রাসূল ﷺ-এর ভবিষ্যতে বিশ্বাস করতেন। তিনি যে একসময় বিশেষ কেউ হয়ে উঠবেন, অনেকের কাছে তা শুনেছেন। একবার এক লোক রাসূল ﷺ-কে দেখে আবু তালিবকে বলেছিলেন, 'আল্লাহর কসম, এই ছেলে একদিন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হবে'। আরেকবার এক সফরে বাহিরা নামে সিরিয়ান এক যাজকের সাথে দেখা হলে আবু তালিবকে তিনি বলেছিলেন, 'তোমার এই ভাতিজার ভবিষ্যৎ ভালো'।

রাসূল ﷺ যে বিশেষ কিছু সেটা শিশু বয়সেই তাঁর মা ঠাহর করেছিলেন। মা'র ধারণা কখনো ভুল হয় না। তিনি বলেছিলেন, 'ও বিশেষ কিছু হবে'। রাসূল ﷺ যখন দাদার বাড়িতে থাকতে গিয়েছিলেন তখন দাদাও প্রায় একই ধরনের কথা বলেছিলেন।

আগেই বলেছি, টিনএজদের মধ্যে অনেক প্রাণশক্তি, সম্ভাবনা। কিন্তু সেগুলো বিকশিত হবে না, যদি তারা এমন পরিবেশ না-পায় যেখানে তাদের কদর বুঝা হয়, তাদের বিশ্বাস করা হয়।

আপনার টিনএজ সন্তান কী করছে, তার বেশিরভাগের সাথে হয়ত আপনি একমত হবেন না। কিন্তু তার মানে এই না যে, সে যে কর্মশক্তি ব্যবহার করছে আপনি তা সম্মান করবেন না, বা তার ভবিষ্যত সম্ভাবনায় বিশ্বাস করবেন না।

বাহিরা সন্ন্যাসী যখন বলেছিলেন যে, তাঁর মধ্যে অমিত সম্ভাবনা আছে। তিনি অবশ্যই নবি হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। আপনার সন্তান নবি হবে না; তবে সে যে একদিন নামকরা কেউ হবে না, তা তো না।

ঘরের বাইরে

আমরা দেখেছি রাসূল ﷺ কী ধরনের পরিবেশে মানুষ হয়েছেন। দেখেছি কিশোর-কিশোরীদের জন্য এ ধরনের পরিবেশ কতটা গুরুত্বপূর্ণ। তবে অনেকে মনে করেন কিশোর-কিশোরীদের সমস্যা বাইরে থেকে উদ্ভব হয়। রাস্তাঘাট, স্কুল বা বন্ধুবান্ধবদের থেকে। কথাটা পুরোপুরি ঠিক না; তবে কিছু সত্য।

প্রযুক্তি আজ ঘরে-বাইরের সীমারেখা মুছে দিয়েছে। ইন্টারনেট আর স্মার্টফোনের কারণে একসময় যেসব কাজ শুধু বাইরে করা যেত, এখন তা ঘরে বসেই করা যায়।

সপ্তম শতাব্দীতে সন্তান লালনপালনের যে-চ্যালেঞ্জ ছিল, আজ তা ভিন্ন। ফেসবুক, টুইটার, ইন্সটাগ্রাম, স্ন্যাপচ্যাটসহ এরকম অসংখ্য উপায় উপকরণের মাধ্যমে বন্ধুরা ঘরবাড়ি বা স্কুলের বাইরে থেকেও আপনার সন্তানের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে।

তবে লালনপালনের মূলনীতিগুলো সবসময় এক। টিনএজ বয়সের ছেলেমেয়েদের কীভাবে সামলাতে হবে তা কিন্তু বদলায়নি। কিশোর-কিশোরীদের চরিত্র ঘরে শিশুকাল থেকেই গড়ে তুলতে হয়। যাতে সে বাইরের উস্কানি থেকে নিজেকে সামলাতে পারে। সেই উস্কানি যত ভিন্ন বা আধুনিক বেশেই আসুক না কেন। বাসাবাড়ির পরিবেশ এবং মা-বাবা'র সাথে টিনএজ বয়সী ছেলেমেয়েদের সম্পর্ক সন্তান লালনপালনের ফাউন্ডেশন। তবে আমাদের সময়ে যে পরিবর্তনগুলো এসেছে, সেগুলোও মাথায় রাখতে হবে।

আমরা এখন দেখব বন্ধুবান্ধব, কাজেকর্মে, সফরের সময় রাসূল ﷺ-এর চলাফেরা কেমন ছিল। আমরা দেখব ঘরে-বাইরে সব জায়গায় আল্লাহ কীভাবে তাঁকে হেফাজত করেছেন। এগুলোর পেছনে কিশোর-কিশোরীদের দেখভাল করার কিছু উপায় পাব, যেগুলো থেকে আমরাও লাভবান হবো। যেমন- আমরা যদি তার বিবেক বিশুদ্ধ রাখি, ধার্মিকতার শিক্ষা দিই, তাহলে রাস্তাঘাটেও ঘরের শিক্ষা তাকে গাইড করবে।

পিয়ার প্রেশার

পরিবেশের যে দিকটা কিশোর-কিশোরীদের ওপর সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলে তা হলো বন্ধুবান্ধব। এমনকি মা-বাবার চেয়েও। এই বয়সের ছেলেমেয়েদের জন্য বন্ধুবান্ধব খুব গুরুত্বপূর্ণ।[২]

রাসূল ﷺ-এর কিশোর বয়সে অবশ্যই বন্ধুবান্ধব থেকে থাকবে। কিন্তু তারা যেহেতু কজন ছিলেন বা তাদের নাম কী ছিল তা জানি না, তাহলে আমরা তাদের চিনব কীভাবে?

তাঁর বন্ধুবান্ধব কুরাইশ গোত্রের হওয়া স্বাভাবিক। এবং প্রতিবেশীদের মধ্যেই কেউ হবেন। কারণ এক গোষ্ঠীর লোকেরা কাছাকাছি থাকত। বালক বয়সে তিনি প্রতিবেশীর ছেলেদের সাথে খেলাধুলা করেছেন। এসব ক্ষেত্রে বাইরে

নানামুখী কঠিন নৈতিক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখী হওয়া খুব স্বাভাবিক। আর সে কারণেই টিনএজ ছেলেমেয়েদের বন্ধুবান্ধব নিয়ে বাবা-মা'র এত চিন্তা।

রাসূল ﷺ একবার বলেন,

> 'আমি একবার কুরাইশ ছেলেদের সাথে ছিলাম। একটা শিকারের জন্য পাথর বয়ে নিয়ে যাচ্ছিলাম। আমরা সবাই নগ্ন ছিলাম। কারণ, সবাই তাদের কটিবস্ত্র ঘাড়ে করে নিয়ে পাথর বহন করছিল। আমিও তাই করছিলাম। ওভাবে যখন হাঁটছিলাম, তখন কে যেন আমাকে প্রচণ্ড জোরে ঘুষি মেরে বলল, 'কটিবস্ত্র পরো'। আমি তখন পরে নিলাম। খালি ঘাড়েই পাথর নিয়ে নিলাম। সেই গ্রুপে কেবল আমিই ছিলাম যে কটিবস্ত্র পরেছিল'।

এই ঘটনা থেকে টিনএজ বয়সীদের ওপর বন্ধুবান্ধবদের প্রভাব বেশ বুঝা যায়। এই প্রভাব মনস্তাত্ত্বিক, আবেগের।

বিবেক

এই ঘটনাকে মুসলিমগণ মহান আল্লাহর বিশেষ দৃষ্টান্ত হিসেবে দেখে। কিন্তু সাধারণ টিনএজ বয়সীরা কীভাবে নেতিবাচক প্রভাব থেকে নিজেদের বাঁচাবে?

সেই সমাজে বালকেরা যখন কাঁধে ভারী কোনো বুঝা নিত, তখন কটিবস্ত্র কাঁধে নিয়ে, সেখানে রেখে বহন করা একদম স্বাভাবিক ছিল। রাসূল ﷺ-এর ক্ষেত্রে এখানে পরিবারের ভূমিকা পালন করেছে মহান আল্লাহর হস্তক্ষেপ।

রাসূল ﷺ-এর ক্ষেত্রে যেভাবে হয়েছে টিনএজ বয়সী সবার ক্ষেত্রে সেভাবে হস্তক্ষেপ হবে না। কাজেই সন্তানদের মধ্যে এই বিবেকবোধ গড়ে তুলতে হবে পরিবারকে। সেই বিবেক তার কানে সুমন্ত্রণা দেবে। নেগেটিভ পিয়ার প্রেশার দমাবে। সিগারেট, মাদক, মেয়ে দেখলে শীষ দেওয়া। এসব থেকে তাকে দূরে রাখবে।

কিশোর-কিশোরীরা যদি একটা ভুল করে বসে, তার বিবেক তখন তাকে 'প্রচণ্ড ঘুষি মারবে'। ভুলকে অভ্যাসে পরিণত হতে দেবে না।

উদাহরণ দিয়ে প্যারেন্টিং

স্যাল সিভিয়ার একটা বই লিখেছেন 'হাউ টু বিহেভ সো ইয়োর চিলড্রেন উইল টু' নামে। সেখানে তিনি বলেছেন, কীভাবে প্রাক-স্কুল সময়ে শিশুদের বিবেক শুরু হয় এবং মা-বাবার সাহায্যে তা আরও গড়ে ওঠে। একসময় এটা তাদেরকে ভালো-খারাপ বেছে নিতে সাহায্য করে (সিভিয়ার, ১০৪-১০৫)। ধৈর্য নিয়ে বাচ্চাদের শেখালে, ধারাবাহিকভাবে গাইড করলে বাচ্চা তার মা-বাবার কণ্ঠ নিজের মধ্যে নিয়ে নেয়। সেটা তার নিজের অংশ হয়ে যায়। সে যদি কোনো খারাপ আচরণে প্রলুব্ধ হয়, তাহলে সেই ভয়েস তাকে ভালো কাজে উদ্দীপ্ত করবে। তীক্ষ্ম বিবেচনাবোধ কিশোর-কিশোরীদের নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বাসযোগ্য করে।

কীভাবে টিনএজদের বিবেক গড়ে তুলবেন

- ভুল করে ফেললে সুন্দরভাবে বুঝান। তার অর্জনে নিজের গৌরব দেখান। কারণ এটা তার মধ্যে আত্মবিশ্বাস গড়ে তুলবে।
- তার জন্য এমন বন্ধুবান্ধব খুঁজুন যারা ইসলামের আদর্শ বুকে ধারণ করে। তাহলে আপনার অনুপস্থিতিতে তারা তাকে পথ দেখাবে।
- অন্যরা পছন্দ করুক কী না করুক, তাকে তার আদর্শে অবিচল থাকতে শেখান। 'না' বলার সামর্থ্য গড়ে তুলুন।

বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ

কিশোর-কিশোরীদের মাঝে যৌন আকাঙ্ক্ষা জাগা স্বাভাবিক ব্যাপার। এটা দমানো চ্যালেঞ্জ না। কারণ, এটা মানুষের স্বভাবজাত প্রকৃতি। চ্যালেঞ্জ হচ্ছে, একে গাইড করা।

নবি ﷺ নিজে এ ব্যাপারে বলেন,

> 'ইসলামপূর্ব যুগে মানুষরা যেভাবে নারীদের প্রতি আকৃষ্ট ছিল, আমি তেমন ছিলাম না। তবে দুরাত বাদে। সেই দুরাতে আল্লাহ আমাকে সুরক্ষা করেছিলেন। এক রাতে আমি মক্কার কিছু ছেলেপুলের সাথে ছিলাম। আমরা পশুর পাল তদারকি

করছিলাম। আমি আমার বন্ধুকে বললাম, 'আমার ভেড়াগুলোকে দেখো, যাতে আমি মক্কার অন্যান্য ছেলেদের মতো মক্কায় কাটাতে পারি'। সে বলল ঠিক আছে। তো আমি গেলাম। আমি যখন মক্কার প্রথম বাসায় পৌছালাম, তখন আমি তাম্বুরিন ও বাঁশিসহ বাজনা শুনতে পেলাম। আমি দেখার জন্য বসলাম। আল্লাহ আমার কানে আঘাত করলেন। আমি শপথ করছি, সূর্যোদয় পর্যন্ত তিনি আমাকে ঘুম থেকে ওঠাননি।

অন্য একরাত। আমি তাকে বললাম, 'আমার ভেড়াগুলোকে দেখো, যাতে আমি মক্কায় রাত কাটাতে যেতে পারি'। যখন মক্কায় এলাম, গতবার যেমন আওয়াজ শুনেছিলাম, এবারও শুনলাম। আমি দেখার জন্য বসলাম। আল্লাহ আমার কানে আঘাত করলেন। আমি শপথ করছি, সূর্যোদয় পর্যন্ত তিনি আমাকে ঘুম থেকে ওঠাননি। ঐ দুই রাতের পর আমি কসম করে বলছি, আর ওসবের ধারে কাছে যাইনি'।

রাসূল ﷺ দুবার চেষ্টা করেছিলেন পার্টিতে যোগ দিতে। কিন্তু দুবারই আল্লাহ তাঁকে বাধা দিয়েছেন তাঁকে অজ্ঞান করে দিয়ে। ভবিষ্যৎ নবির জন্য এটা ছিল মহান আল্লাহর বিশেষ সুরক্ষা। এই ঘটনা থেকে আপনার টিনএজ বয়সী ছেলেমেয়েরা কীভাবে ফায়দা নেবে?

রাসূল ﷺ তার কিশোর বয়সে পার্টিতে যেতে চেয়েছিলেন, এমনকি দুবার চেষ্টা করেছিলেন, এটা এই কাহিনির মজার দিক না; বরং তিনি যে তৃতীয়বার আর চেষ্টা করেননি সেটাই এই ঘটনার সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিক। এটা আপনার কিশোর বয়সী ছেলেমেয়েদের অনুপ্রেরণা দিতে পারে।

সর্বশক্তিমান আল্লাহ সবসময় খারাপ থামাতে চান না। কখনো কখনো একে কঠিন করে তোলেন। খারাপ কাজ করার সময় টিনএজ বয়সী ছেলেমেয়ে প্রায়ই তার প্রথম চেষ্টায় হোঁচট খাবে। খারাপ পথ সোজা এমনটা যেন সে না-ভাবে সেটাই আল্লাহ চান। পথেঘাটে নানা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে রাখেন যা তাকে দু একবার বাধা দেয়।

যেমন, সে হয়ত প্ল্যান করেছে খারাপ কোনো জায়গায় যাবে। খারাপ জায়গা বলতে কনসার্ট, সিনেপ্লেক্স এ ধরনের জায়গাও হতে পারে, যেগুলোকে আজকাল ঠিক 'খারাপ' বলা হয় না। তো দেখা গেল যেদিন যাবে বলে ঠিক করেছে সেদিন অসুস্থ হয়ে গেল। ইন্টারনেটে খারাপ কিছু দেখতে চাওয়ার সময় হঠাৎ করে নেটের লাইন চলে গেল। অথবা প্রথমবার সিগারেট খাওয়ার সময় লাগাতার কাশি।

এখন বাধাগুলোকে সে স্বাভাবিকভাবে নেবে, না আল্লাহর তরফ থেকে সতর্কবাণী হিসেবে নেবে, সেটা নির্ভর করে ছোটবেলায় বাবা-মা তাকে কীভাবে বড় করেছেন তার ওপর। তারা ভাবতে পারে এগুলো দৈব কাকতাল, যে কারও বেলাতেই হতে পারে। অথবা তারা এমনও ভাবতে পারে যে, তাদের খারাপ পথ থেকে থামানোর জন্য এগুলো মহান আল্লাহর তরফ থেকে সতর্কবাণী। তো দেখা যাবে দুতিনবার চেষ্টায় বাধা পাওয়ার পর সে নিজেই তার আচরণ বদলে ফেলল।

মা-বাবার দায়িত্ব হলো ছেলেমেয়েদের মধ্যে এই মানসিকতার বিকাশ ঘটানো। যাতে করে যদি সে পিছলে পড়ে, তার বিবেক তাকে উঠিয়ে আনবে। এটা যাতে অভ্যাসে পরিণত না-হয় তা থেকে বাধা দেবে। এটাই একজন টিনএজ ছেলেমেয়েকে আস্থাভাজন করে। নির্ভরযোগ্য করে।

আল্লাহ রাসূল ﷺ-এর কানে আঘাত করে তাঁকে অচেতন করে দিয়েছিলেন পার্টিতে পৌঁছানোর আগেই। ভুল পথে যাওয়ার চেষ্টায় আপনি যেসব বাধা পান সেগুলো আসলে আপনার প্রতি মহান আল্লাহর ভালোবাসার দৃষ্টান্ত। তিনি চান না যে, আপনি অন্ধকারে যোগ দেন। প্রতিবন্ধকতার পেছনের মানে বুঝার চেষ্টা করুন। এগুলো এমন সাধারণ কিছু না, যা যে কারও ক্ষেত্রেই হতে পারে।

কাজ

এই অধ্যায়ের বাকি অংশে রাসূল ﷺ-এর কাজ ও সফর নিয়ে কথা বলব। বলব কীভাবে টিনএজ বয়সীরা এ থেকে উপকৃত হতে পারে।

রাসূল ﷺ-এর কাজকর্ম শুরু রাখাল হিসেবে। চাচা আবু তালিবকে সাহায্য করার জন্য এ কাজ করতেন। এভাবে তিনি প্রচুর অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। রাসূল ﷺ একবার বলেছিলেন, 'এমন কোনো নবি নেই যে, রাখাল ছিল না'।

রাখালের কাজ গবাদিপশুর খাওয়াদাওয়া সংগ্রহের মতো সহজ কিছু না। এ কাজের জন্য বেশকিছু ব্যক্তিগত দক্ষতা ও গুণ লাগে।

- নেতৃত্বঃ পশুগুলোকে কোন পথে নিয়ে যেতে হবে। খাওয়ানোর জন্য কোথায় থামতে হবে।
- সততাঃ ভেড়াগুলোকে সততার সাথে ব্যবস্থাপনা করতে হয়। মালিকের বিশ্বাস ভাঙা যায় না। যেমন অনুমতি ছাড়া ওগুলোর দুধ খাওয়া।
- ফোকাসঃ মুহূর্তের মনোযোগ হারিয়ে ফেললে পালের ভেড়া হারিয়ে বা চুরি হয়ে যেতে পারে।
- মমতাঃ পশুপালের সাথে মমতার সম্পর্ক গড়ে তোলা, এমন যে আপনি আপনার প্রতিটা ভেড়াকে একটা একটা করে চেনেন।
- লেগে থাকাঃ বৈরি, কঠিন আবহাওয়া সহ্য করা ও দীর্ঘ সময় ধরে দেখাশোনা করা।

ভৌগলিকবিদেরা পৃথিবীজুড়ে পাঁচটি অঞ্চলকে শতায়ুদের 'ব্লু জোন' বলেছেন। এসব অঞ্চলে মানুষের গড় আয়ু বেশি। এগুলোর মধ্যে আছে জাপান, গ্রিসের দ্বীপ অঞ্চল ও ইতালির সারাদিনিয়া দ্বীপ।

ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক বলছে এই অঞ্চলগুলো একটা থেকে আরেকটা অনেক দূরে। কিন্তু তাদের জীবনযাপনের কিছু ব্যাপার এক। যেমন-পারিবারিক জীবন। এদের মধ্যে ধূমপান নেই। শারীরিক কাজে গুরুত্ব দেয় এরা। ম্যাগাজিনে বলেছে যে, এসব অঞ্চলের বুড়োরা বয়স হলেই হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকে না; বরং কম-চাপের কাজে ব্যস্ত থাকে। যেমন গবাদিপশু দেখাশোনা।

গবাদিপশু দেখাশোনা আপনার কিশোর-কিশোরীর জন্য আদর্শ ক্যারিয়ার এটা এখানে প্রমোট করা হচ্ছে না। বলতে চাচ্ছি, যদি কিশোর-কিশোরীরা স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন করে তাহলে তারা মানসিকভাবেও অনেক শান্তিতে থাকবে।

এবার আমরা সফর নিয়ে কথা বলব। দেখব কীভাবে সেটা একজন টিনএজের অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করে।

সফর

সাধারণভাবে টিনএজরা রুটিন অপছন্দ করে। সফর ও পরিবর্তন পছন্দ করে। ১৩ বছর বয়সে আবু তালিব যখন সিরিয়া সফরে গেলেন, তখন রাসূল ﷺ তার সাথে যাওয়ার আগ্রহ দেখালেন। এই বয়সে মক্কা থেকে সিরিয়া সফর খুব কষ্টকর। এর দূরত্ব প্রায় ১৫০০ কিলোমিটার। ২০-৩০ দিনের সফর। পিচঢালা পথে গাড়িতে করে যারা মক্কা থেকে দামাস্কাস গিয়েছেন তাদেরই অনেকে সফরের ক্লান্তি নিয়ে অভিযোগ করেন। তাহলে উটে চড়ে সেখানে যাওয়া কেমন ছিল ভেবে দেখেন।

কিশোর-কিশোরীরা যদিও প্রাণশক্তিতে ভরপুর এবং তারা রোমাঞ্চ পছন্দ করে, কিন্তু রাসূল ﷺ-এর জন্য এ যাত্রা খুব কঠিন হওয়ার কথা। একে তো এত লম্বা দূরত্ব সফরের অভিজ্ঞতা আগে তাঁর ছিল না। অন্যদিকে বাণিজ্য কাফেলায় তার সমবয়সী আর কেউ না-থাকায় তার মধ্যে বিরক্তি চলে আসাটা স্বাভাবিক ছিল।

আমি জানি না এই সফরে সফরকারীরা কীভাবে সময় কাটিয়েছিলেন। কী কী দর্শনীয় স্থান তারা দেখেছিলেন, তবে নিচের জিনিসগুলো দেখার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে:

- ঐতিহাসিক স্থান: মাদাইন সালিহ। আজকের দিনে উত্তরপশ্চিম সাউদি আরাবিয়া। নাবাতি সভ্যতা পাথরে কেটে এই শহর বানিয়েছিল। আধুনিক জর্দানের পেত্রা শহরের মতো। অন্যান্য ঐতিহাসিক স্থাপনার মধ্যে আছে সোডোম ও গোর্মরাহ। রোমানদের তৈরি মসৃণ রাস্তা।

- বৈচিত্র্যময় প্রাকৃতিক লীলা ও আবহাওয়া: মক্কার আশেপাশের পাহাড় ও সমভূমি; ওয়াদি সারহানের জলাভূমি, বর্তমানে এটা জর্দান-সাউদির সীমান্তের কাছে; নেফুদ, প্রচুর উপবৃত্তাকার নিচু জায়গা ও মরুভূমি; জর্দানে সাত ঘুমন্ত যুবকের গুহা। উত্তর আরব উপদ্বীপ দিয়ে লোহিত সাগরের পাশ ঘেঁষে কাফেলা দক্ষিণ সিরিয়ায় বসরায় নেফুদ মরুভূমি পার করেছে।
- বিভিন্ন সমাজ ও ধর্ম: হিজাজের মূর্তিপূজারি, মদিনার ইহুদি গোষ্ঠী, লাখমিদ, বানু জুদহাম ও গাস্‌সানিদ গোত্রের খ্রিষ্টান আরব, ও সন্ন্যাসীরা, যার মধ্যে একজন ছিল বাহিরা।

সফর করা আজকাল অনেকের সামর্থ্যের মধ্যে। সহজও। তাই টিনএজ বয়সীদের জন্য সফর আসল চ্যালেঞ্জ না; বরং, সেই সফরকে তারা নিজেদের ও নিজেদের ব্যক্তিগত সামর্থ্য বিকাশে কীভাবে ব্যবহার করবে সেটা চ্যালেঞ্জ। এটা যেকোনো বয়সী মানুষদের জন্যও খাটে।

সিরিয়া সফরের মাধ্যমে রাসূল ﷺ নিজে বিভিন্ন ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় স্থানগুলো দেখেছেন। তাঁর চাচার সাথে বিভিন্ন বাজারে ঘুরে ঘুরে নানান সংস্কৃতি, ভাষা ও প্রথার মুখোমুখী হয়েছেন। বাহিরা সন্ন্যাসীর সাথে দেখা হয়েছে।

নিজের থেকে ভিন্ন সংস্কৃতির মানুষদের সাথে মেশা ও অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য কিশোর-কিশোরীদের উন্মুখ হয়ে থাকা দরকার। যেগুলো তাদের অভিজ্ঞতাক সমৃদ্ধ করবে সবসময় সেসব খুঁজা উচিত তাদের।

নিচের টেবিল আপনাকে মনে করাবে কীভাবে একজন টিনএজ বয়সী তার টিনএজ বয়সের সর্বোচ্চ ব্যবহার করতে পারে, আর কীভাবে রাসূল ﷺ কিশোর বয়সের কঠিন সময় নিরাপদে পার করেছিলেন।

রাসূল ﷺ-এর কিশোর বয়স থেকে ফায়দা	
রাসূল ﷺ-এর কৈশোর	আপনার কৈশোর
রাসূল ﷺ তাঁর চাচাকে সাহায্য করার জন্য রাখালের দায়িত্ব পালন করেছেন।	আপনার বাবা-মাকে সাহায্য করুন। এমনকি যদি তারা সরাসরি সাহায্য না-ও চায়।
রাসূল ﷺ তাড়াহুড়ো করে খেতেন না। বিশেষ করে যখন অনেকের সাথে বসে একসঙ্গে খেতেন।	কিছু চাওয়ার সময় ধৈর্য ধরুন, ভদ্র থাকুন। বন্ধুত্বপূর্ণ থাকুন।
রাসূল ﷺ সবসময় চুল আঁচড়ে রাখতেন। ছিমছাম থাকতেন।	আপনার সামগ্রিক বাহ্যরূপের খেয়াল রাখুন, এমনকি যদি বাসায় পরিবারের সাথে থাকেন তবুও।
আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে সুরক্ষা করেছিলেন গায়েবি আওয়াজের মাধ্যমে তাঁকে তাঁর কটিবস্ত্র পরতে বলে।	আপনার অভ্যন্তরীণ ভয়েস ও বিবেক আপনাকে বলে দিক কোনটা খারাপ কোনটা ভালো। আস্থাভাজন থাকুন। এমনকি যদি আপনি বাবা-মা বা অন্য জ্ঞানী কারও তত্ত্বাবধান থেকে দূরে থাকেন তবুও।
খারাপ পথে যাওয়া থেকে আল্লাহ রাসূল ﷺ-কে নিরাপদ রেখেছিলেন। রাসূল ﷺ শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন।	আপনার বেলায় আল্লাহ হয়ত এমন প্রকাশ্য হবেন না। কাজেই আপনাকে তাঁর সুরক্ষার নিদর্শন খুঁজে নিতে হবে।
রাসূল ﷺ বাহিরা সন্ন্যাসীকে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, তিনি মূর্তিপূজারীদের দেবদেবীর নামে কসম কাটবেন না।	কোনো দল সংখ্যাগরিষ্ঠ বলেই অন্ধের মতো তাদের অনুকরণ করবেন না। নিজের বিশ্বাস ভদ্রোচিতভাবে জানিয়ে দিন।
রাসূল ﷺ সিরিয়ায় সফর করেছিলেন। সেই কাফেলায় তিনি ছিলেন সবচেয়ে কমবয়স্ক।	নিজেকে নতুন রোমাঞ্চের সামনে উন্মোচিত করুন। যা দেখেন তা দিয়ে নিজের অভিজ্ঞতার ঝুলিকে সমৃদ্ধ করুন।

তরুণ মুহাম্মাদ ﷺ

কিশোর বয়সে ছেলেমেয়েরা নানারকম বৈচিত্র্যময় অভিজ্ঞতা অর্জন করে। এসব অভিজ্ঞতা থেকে অনেকেই ভবিষ্যৎ জীবনে চলার পাথেয় কুড়িয়ে নেয়। যারা তা করে তারা পরিণত বয়সে সেগুলো সমাজের সাথে শেয়ার করে।

রাসূল ﷺ তরুণ ও যুবক বয়সে তাঁর চাচার পরিবারকে সাহায্য করেছেন। নিজ শহরের বিভিন্ন সংঘাত সমাধানে সামাজিক দক্ষতা ও সৃজনশীলতা কাজে লাগিয়েছেন। সামাজিকভাবে তিনি সক্রিয় ছিলেন। তাঁর বেশকিছু বন্ধুবান্ধব ছিল। এরপরও মাঝে মাঝে তিনি একান্ত নিজের জন্য সময় বের করে নিতেন এবং তাতে কোনোরকম একাকী বা একঘেয়ে বোধ করতেন না। প্রযুক্তি আর সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম নিয়ে বেশিরভাগ তরুণ ব্যস্ত। এই ব্যস্ততার মাঝেও সমাজে সক্রিয় থাকার উপায় খুঁজতে হবে। নিজের জন্যও সময় খুঁজে নিতে হবে। ব্যালেন্সটা জরুরি।

সৃষ্টিশীল হোন

গত অধ্যায়ে আমরা কিশোর রাসূল ﷺ-কে দেখেছি। কীভাবে তিনি চ্যালেঞ্জে মোকাবিলা করেছেন, তাঁর এনার্জিকে প্রোডাক্টিভ উপায়ে ব্যবহার করে কাজ ও সফর থেকে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন সেগুলো দেখেছি।

এই অধ্যায়ে আমরা দেখব ২০ ও ৩০-এর কোঠার রাসূল ﷺ-কে। যে বয়সে একজন তার লব্ধ অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে সমাজসেবা করতে পারে।

রাসূল ﷺ মক্কায় 'উদীয়মান তারকা'-তে পরিণত হন। সমস্যা সমাধানে তাঁর দক্ষতার কারণে মানুষের নজর কেড়েছিলেন। কাবাঘর নির্মাণ নিয়ে কুরাইশদের মধ্যকার বিতণ্ডা নিরসনে তিনি চমৎকার এক সমাধান বের করে দেন।

ব্যবসায়ী হিসেবে তিনি সততার খ্যাতি অর্জন করেন। গ্রাহকদের আস্থা কুড়ান। সে সময়ের মক্কার এক শ্রদ্ধাভাজন ব্যবসায়ী নারী খাদিজার শ্রদ্ধা অর্জন করেন। তাঁরা দুজনে পরে বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হন। তাদের ঘরে ছিল চার মেয়ে, দুই ছেলে।

বাস্তব মডেল

পরিণত বয়সের রাসূল ﷺ-এর যে দিকটা সবচেয়ে অনুপ্রেরণা জাগায় তা হচ্ছে, কিশোর বয়স থেকেই দায়িত্বগ্রহণের মানসিকতা। চাচার পরিবারকে সহযোগিতা করার জন্য তিনি রাখাল হিসেবে কাজ করেছেন। অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য সিরিয়ায় গিয়েছেন। মানুষের সাথে সুন্দরভাবে কথা বলেছেন। ইফেক্টিভলি ডিল করেছেন। কিন্তু তাই বলে অন্যকে খুশি করার জন্য নিজের আদর্শে ছাড় দেননি। তরুণ বয়সে তাঁর মধ্যে এই গুণগুলো স্বাভাবিক ছিল। কেউ কেউ ভাবেন, রাসূল ﷺ মনুষ্য ক্ষমতার বাইরে। কিন্তু কথাটা কুরআনের সাথে সাংঘর্ষিক হয়ে যেতে পারে। যেমন, সেই একই লোক হয়ত কুরআনের এই আয়াত উদ্ধৃত করবেন,

> 'আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর মধ্যে তোমাদের জন্য অবশ্যই চমৎকার উদাহরণ আছে'। আয যুখরুফ : ৭৩

কিন্তু সেই তিনিই হয়ত মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে বলবেন, রাসূল ﷺ বলে অমুক অমুক কাজ করতে পেরেছেন। আমরা কি আর পারব?

গভীর ও নিখাদ শ্রদ্ধার কারণে কোনো কোনো মুসলিম ভাবেন তাদের আর তাঁর জীবনের মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই। রাসূল ﷺ-এর কাহিনি শুধু সমীহ জাগানোর জন্য। এতে কি কোনো বাস্তব উদাহরণ নেই, যা থেকে আমরা আরও ভালো মানুষে পরিণত হতে পারি? আমরা তাঁর জীবনী পড়ি, তাঁর প্রতি ভক্তি জাগে। কিন্তু নিজের জীবনে কীভাবে তাঁর জীবন দৃষ্টান্ত প্রয়োগ করতে পারি, সেটা দেখি না।

চ্যালেঞ্জটা এখানেই। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ধরে রেখে কীভাবে তাঁকে আমরা আমাদের প্রতিদিনের জীবনে অনুপ্রেরণা হিসেবে প্রয়োগ করব।

বিষয়টা এভাবে দেখুন, একজন মানুষ তার মনুষ্য ক্ষমতা কাজে লাগিয়ে যত সেরা হতে পারেন, রাসূল ﷺ ছিলেন তা-ই। আমাদের কাজ হলো কত ভালোভাবে আমরা এখন তাকে অনুসরণ করতে পারি, সেই পথ খোঁজা।

এতদিন পর্যন্ত আপনি কী করলেন আর রাসূল ﷺ তাঁর এক জীবনে কী করেছেন, তার মধ্যে বিস্তর ফারাক। সাধারণ চোখে দেখলে এতে আপনি হতাশ হয়ে পড়তে পারেন। কিন্তু বিষয়টাকে এভাবে না-দেখে মোটিভেশন হিসেবে নিন। রাসূল ﷺ যা করেছেন আপনি কখনো তাঁর কাছাকাছি যেতে পারবেন না, এমনটা ভেবে কখনো হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকবেন না।

নবি হওয়ার আগেও কিন্তু তিনি অসাধারণ মানুষ ছিলেন। কুরআন তাঁকে বর্ণনা করছে, 'নৈতিক চরিত্রের পরাকাষ্ঠা হিসেবে'। আল কলাম : ৪

এই আয়াত যখন অবতীর্ণ হয়, তখনও তিনি কিন্তু মক্কাতেই ছিলেন। বিষয়টা এমন না যে, এই আয়াত অবতীর্ণের পর তার চরিত্র এক রাতের মধ্যে বদলে গেছে; বরং বছরের পর বছর ধরেই তাঁর চরিত্র এমন ছিল। কাজেই আমরা বলতে পারি, নবি হওয়ার আগেই তিনি নীতিবাগিশ ছিলেন। নবি হওয়ার পর সেই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আরও সমৃদ্ধ হয়েছে।

খাদিজাকে বিয়ের সময় তাঁর বয়স ছিল ২৫। খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেছিলেন, তিনি তাঁকে ভালোবাসেন তাঁর দয়া, সততা ও সত্যবাদিতার জন্য। তখন কিন্তু তিনি নবি ছিলেন না।

তরুণ বয়সে রাসূল ﷺ কেমন ছিলেন, সেটা বুঝার জন্য আমরা তার শারীরিক অ্যাপিয়ারেন্স দিয়ে শুরু করব। কারণ একজন ব্যক্তির অ্যাপিয়ারেন্স সাধারণত শৈশবে বদলায়। আর তরুণ বয়সে মুখমণ্ডলের বৈশিষ্ট্যগুলো স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

আমরা তার মুখ ও চালচলন দিয়ে শুরু করব। কারণ এ দুটো কোনো ব্যক্তির ব্যাপারে প্রথম আমাদের নজর কাড়ে।

রাসূল ﷺ দেখতে কেমন ছিলেন?

নির্ভরযোগ্য উৎসগুলো থেকে রাসূল ﷺ-কে যেমন পাওয়া যায়-

তাঁর মুখ ছিল কিছুটা গোলাকৃতির। দীপ্ত সুন্দর চেহারা। লালাভ ফর্সা গায়ের রং। মুখে কোনো দাগ ছিল না। মসৃণ। কালো বড় চোখ। বড় চোখের পাতা। সাদা দাঁত। কণ্ঠ ছিল নরম। ঠাণ্ডায় অনেকের গলা যেমন হয়। তবে অনেকের স্বাভাবিক কণ্ঠও এরকম হয়। চুলগুলো মাঝারি। তা কাঁধ স্পর্শ করেনি। আবার খুব ছোটও ছিল না। তিনি যখন চুল কাটতে দেরি করতেন, তখন তা কাঁধ পর্যন্ত পৌঁছাত। যখন তিনি তা কাটতেন, তিনি কান পর্যন্ত কাটতেন অথবা কানের লতি পর্যন্ত।

তাঁর উচ্চতা ও গড়ন ছিল মাঝারি। প্রশস্ত কাঁধ। পেটানো শরীর। পেশিবহুল না; তবে যথেষ্ট ভারি হাত, মোটা আঙুল। পা ও অন্যান্য অঙ্গগুলো সোজা ও লম্বা। পায়ের পাতার বাইরের বাঁকানো অংশটা মাটিতে লাগত না।

তাঁর হাঁটার মধ্যে একটা কর্মচঞ্চলতা ছিল। সতেজ ভাব ছিল। মাটির সাথে পা ঘেঁষে ঘেঁষে চলতেন না। তাড়া না-থাকলে ধীরস্থিরভাবে হাঁটতেন। শান্তভাবে কিছুটা সামনের দিকে ঝুঁকে হাঁটতেন, যেন কোনো ঢালু বেয়ে নামছেন।

তার চলাফেরা ছিল দ্রুত। কারও দিকে ফিরলে পুরো শরীর ঘুরিয়ে ফিরতেন। শুধু মাথা ঘোরাতেন না। তাঁর ঘাম ছিল মুক্তোর মতো, এত স্বচ্ছ ছিল সেগুলো। কস্তুরি ও অম্বরের চেয়ে তাঁর গায়ের ঘ্রাণ সুন্দর ছিল।[২]

বাহ্যিক রূপ জেনে কী হবে? বইয়ের প্রচ্ছদ দেখে তো আর বুঝা যায় না বইটা কেমন। কাজেই নবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর বাহ্যিক রূপ জানার প্রয়োজন কী?

রাসূল ﷺ-এর কিছু কিছু ব্যাপার মহান আল্লাহর তরফ থেকে উপহার। তবে কিছু আছে যা রাসূল ﷺ-এর বাহ্যরূপ থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে আপনি আপনার জীবনে কাজে লাগাতে পারেন।

তাঁর দাঁতগুলোর মধ্যকার স্বাভাবিক যে ফাঁক ছিল, আপনার হয়ত তেমন না; কিন্তু দাঁতের যত্ন ও সেগুলো সাদা ও পরিষ্কার রাখার ব্যাপারে আপনি নজর দিতে পারেন। আপনার গায়ের স্বাভাবিক ঘ্রাণ হয়ত কস্তুরির মতো না, যেমনটা

রাসূল ﷺ-এর ছিল (আর এটা কেবল তাঁর বেলাতেই ইউনিক ছিল), কিন্তু আপনি নিয়মিত গোসল করতে পারেন। হাতপা ধুয়ে রাখতে পারেন।
আরও যেসব দিক আপনি খেয়াল রাখতে পারেন-

রাসূল ﷺ-এর বাহ্যিকরূপ	আপনার বাহ্যিকরূপ
রাসূল ﷺ-এর চুল পরিপাটি ছিল।	আপনি চুল আঁচড়ান।
রাসূল ﷺ মোটাসোটা ছিলেন না।	শরীরচর্চা করুন। স্বাস্থ্যকর খাবার খান।
তাঁর দাঁত সাদা ছিল।	ক্যাভিটি ও হলুদ হয়ে যাওয়া থেকে নিজের দাঁতকে রক্ষা করুন।

বিষয়গুলো নতুন কিছু না। কিন্তু এগুলো মানুষ খুব সহজেই ভুলে যায়। যেমন ফ্লসিং ও হালকা ব্যায়াম।

রাসূল ﷺ-এর ব্যক্তিত্ব

রাসূল ﷺ-এর ব্যক্তিত্বের যে দিকটা আপনাকে নাড়া দিতে পারে, তা হলো ভারসাম্য বজায় রেখে চলা। তিনি সহজে লোকজনদের সাথে মেলামেশা করতেন, বন্ধুবান্ধবদের সাথে শক্ত নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেছিলেন, সমাজকে সাহায্য করার জন্য উদ্ভাবনীমূলক পদক্ষেপ নিতেন। কিন্তু একই সময়ে দৈনন্দিন জীবনের সমস্যায় পুরোপুরি ডুবে যেতেন না। একাকী চিন্তাভাবনার প্রয়োজনের কথা ভুলে যেতেন না। প্রথমে আমরা দেখব রাসূল ﷺ তাঁর স্থানীয় সমাজের সাথে কীভাবে মেলামেশা করেছেন। ৫৯১ সালে বাণিজ্য নগরী মক্কায় একটা ঘটনা বেশ তোলপাড় ফেলে দিয়েছিল। মক্কার এক বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আল আস ইব্‌ন্ ওয়াইল এক ইয়েমেনি ব্যবসায়ীর থেকে পণ্য নিয়েছিল টাকা শোধ না করে। সেই ইয়েমেনি মক্কার নেতাদের হস্তক্ষেপ কামনায় আকুতি জানিয়েছিল।

সম্মানীয় নেতারা আল আসের কাছে যেয়ে তাকে টাকা দিতে বাধ্য করে। এরকম অবিচার যেন আবার না-হয় এবং মক্কার বাণিজ্যনির্ভর অর্থনীতিতে যেন বিরূপ প্রভাব না-আসে, নগর নেতারা সেজন্য একটা চুক্তি করেন। এর নাম হিলফুল ফুদূল (মর্যাদাপূর্ণদের মৈত্রী)। ন্যায্য লেনদেন নিশ্চিত করার জন্য এই চুক্তি। বহিরাগত ব্যবসায়ীদের স্বার্থ রক্ষাও এই চুক্তির অন্তর্ভুক্ত ছিল।

রাসূল ﷺ তখন যদিও মাত্র ২১ বছরের তরুণ, তিনি বয়োজ্যেষ্ঠ নেতাদের সাথে যোগ দিয়েছিলেন চুক্তি করার জন্য। বিশিষ্ট গোষ্ঠীপ্রধান আবদুল্লাহ জুদআনের বাড়িতে তারা জড়ো হয়েছিলেন। তিনি সেখানে কেবল পর্যবেক্ষণকারী রূপে ছিলেন না; বরং সেই চুক্তির মুখর সমর্থক ছিলেন।

অনেক দশক পর রাসূল ﷺ এ ঘটনার উল্লেখ করে বলেন,

> 'আবদুল্লাহ জুদআনের বাড়িতে একটি চুক্তিতে আমি সাক্ষী ছিলাম, ইসলামের সময়ও যদি আমাকে এই চুক্তিতে ডাকা হতো, তাহলে আমি সাড়া দিতাম।'

এই ঘটনা থেকে সমাজের ইস্যুগুলো নিয়ে আমরা চিন্তা করতে শিখি। এর আপনার বয়স বা ভূমিকা রাখার ধরন যা-ই হোক, সমাজ পরিবর্তনে ইতিবাচক ভূমিকা রাখুন। পরিবর্তনের জন্য আপনার বয়স অনেক কম-বেশী এসব সাতপাঁচ না-ভেবে নিজের ব্যক্তিত্ব বিকশিত করুন। তখন আপনি নিজেই আপনাকে সমাজের উঁচুদের মাঝে খুঁজে পাবেন।

সৃজনশীলতা

সমাজের সমস্যা নিরসনে তিনি সৃজনশীল সমাধান নিয়ে এসেছিলেন। মক্কার গোত্রপতিরা মিলে ঠিক করল কাবাঘর পুনর্নির্মাণ করবে। কিন্তু কালোপাথরটা জায়গামতো রাখা নিয়ে সবার মধ্যে লেগে গেল। কারণ, সবাই এই দুর্লভ সম্মান অর্জন করতে চাচ্ছিলেন। পাথরটি জান্নাত থেকে এসেছে। সেই সময়ের আরবের অনেকে এটাকেও পূজো করত। এখান থেকে তাদের তাওয়াফ শুরু করত। ৬০৫ সালের প্রবল বন্যায় কাবাঘরের কাঠামো নষ্ট হয়ে যায়।

উপায়ন্তর না-পেয়ে তারা রাজি হলো যে, আগামীকাল প্রথম যে লোক পবিত্র হারামে প্রবেশ করবে সে-ই বিচারক হবেন এবং সমস্যা নিয়ে সিদ্ধান্ত দেবেন। রাসূল ﷺ প্রবেশ করলেন প্রথমে। সে সময়ে রাসূল ﷺ-এর বয়স ছিল ৩৫ বছর। সমস্যা সমাধানের জন্য আরবদের কাছে এই বয়স যথেষ্টই কম। এর একচেটিয়া দায়িত্ব ছিল গোত্রনেতাদের। যা হোক, যেহেতু সেই প্রথম হারামে এসেছে তাই তারা রাজি হলেন যে, মুহাম্মাদই সমাধান দিক।

রাসূল ﷺ দ্রুত সমাধান করলেন। কালো পাথরটাকে একটা কাপড়ের উপর রাখলেন। এরপর প্রত্যেক গোত্রের একজন প্রতিনিধি কাপড়ের একটা অংশ ধরলেন; মাটি থেকে এক মিটার উঁচুতে। সবাই মিলে কালোপাথরটিকে জায়গায় বসালেন। কন্সট্যানটিন গোর্গুয়ের মতে,

> 'মুহাম্মাদ ﷺ যেভাবে চিন্তা করেছে সেটা তার সৃজনী ক্ষমতার ইঙ্গিত দেয়। তার মধ্যে যদি এ ধরনের ক্ষমতা না থাকত, তাহলে সে নবি হতে পারত না'।[৩]

রাসূল ﷺ-এর সমাধান ছিল সৃজনশীল ও তাৎক্ষণিক। এমন সমস্যা আগে কখনো হয়নি, কারণ এবারই প্রথম মক্কাবাসীরা কাবাঘর সংস্কার করছিল। আর এই বিতণ্ডা পাঁচদিন ধরে চলছিল। রাসূল ﷺ যদিও কল্পনা করেননি যে, তিনি এতে জড়িয়ে যাবেন, কিন্তু সৃষ্টিশীল চিন্তার মাধ্যমে জায়গায় দাঁড়িয়েই তিনি সেই সমস্যার সমাধান করতে পেরেছিলেন। এখানেই রাসূল ﷺ-এর প্রতিভার পরিচয়।

কর্মক্ষেত্রে প্রতিযোগিতাশীল বিশ্বে সৃজনশীলতা আর বাক্সের বাইরে চিন্তাভাবনা করতে পারে এমন লোকদের কদর ভীষণ। নিয়ত পরিবর্তনশীল দুনিয়ায় যারা কেবল রুটিন কাজে দক্ষ তারা যে টিকে থাকবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। যাদের উদ্ভাবনী চিন্তা ভালো, অপ্রত্যাশিত পরিবর্তনে যারা নতুন করে ভাবতে পারে, সে অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিতে পারে, বর্তমান পৃথিবী তাদের জন্যই।

এ কারণে উদ্ভাবনের ওপর বই ও শিক্ষামূলক ম্যাটেরিয়ালের সংখ্যার বান ছুটেছে। বেশিরভাগ আধুনিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ পদ্ধতির অংশ হয়েছে সৃজনশীল চিন্তার বিকাশ, ক্রিটিকাল থিংকিং ও উদ্ভাবন।[৪]

কীভাবে সৃজনশীল হবেন?

- প্রতিটি বিষয়ের মাঝে নতুন সংযোগ খুঁজুন।
- যা শিখেছেন তা যদি আর না-চলে তাহলে তা রেখে দিন। নতুন কিছু শিখতে তৈরি থাকুন।
- দেখা সাক্ষাতের মাধ্যমে নিজেকে অন্যান্য উদ্ভাভবকদের কাতারে রাখুন। তাদের অর্জনগুলো শিখুন।

সংঘাত নিরসন

এ ঘটনায় রাসূল ﷺ যা করেছেন, তা সহজ ছিল না। যেকোনো সময়ে এখানে একটা সংঘাত বেধে যেতে পারত। তিনি সেটা থামিয়েছেন। পাঁচদিন ধরে এই বিতণ্ডা চলছিল। যেকোনো মুহূর্তে তা সহিংসতায় রূপ নিতে পারত। (অধ্যায় তিন থেকে স্মরণ করুন, কাবাঘরের নিয়ন্ত্রণ কে নেবে এটা নিয়ে কুসাই গোষ্ঠী কিন্তু যুদ্ধে লাগার অবস্থায় চলে গিয়েছিল। অনুরূপভাবে, অতীতে গোষ্ঠী লড়াই প্রায়ই হতো। তবে যারা স্মার্ট সমাধান দিতে পারতেন, তারা চাইলে এগুলো বন্ধ করতে পারতেন)। রাসূল ﷺ সেই সংঘাতের স্মার্ট সমাধান দিয়েছিলেন।

কীভাবে সংঘাত নিরসন করবেন?

- **সহযোগিতা:** এমন সমাধান দিতে হবে যা সবাই মেনে নেয় (যেমন কাবাঘরে কালো পাথর রাখা নিয়ে রাসূল ﷺ যে সমাধান দিয়েছিলেন)।
- **ছাড় দেওয়া:** মীমাংসায় পৌঁছানোর জন্য সব পক্ষকে কিছু না কিছু ছাড় দেওয়াতে রাজি করাতে হবে।
- **পারস্পরিক অর্জন:** কোনোকিছুতে লাভ হবে। এটা আপনি যেভাবে বুঝেছেন বা দেখেছেন সেভাবে অন্যদেরকে বুঝিয়ে আশ্বস্ত করুন।
- **স্বীকার করা:** হাতের সমস্যাটা উপেক্ষা করবেন না বা ফেলে রাখবেন না। খুব তুচ্ছ বা সামান্য বিতণ্ডা হলে ভিন্ন কথা।

কর্মক্ষেত্রে, পরিবারে সংঘাত নিরসন এখন এক অতি গুরুত্বপূর্ণ দক্ষতায় পরিণত হয়েছে। যুদ্ধের মানবিক ও অর্থনৈতিক খরচ অনেক অনেক বেশি। কিন্তু মানুষ শান্তিতে থাকতে চায়। কাজেই অন্য যেকোনো সময়ের চেয়ে যেসব লোক সংঘাত নিরসনে দক্ষ তাদের কদর আজ অনেক।

কাজ

বহুদিন ধরে রাসূল ﷺ ব্যবসায়ী হিসেবে কাজ করেছেন। রাখাল জীবনে সমাজের যেসব নোংরা জিনিস তাকে দেখতে হয়নি, ব্যবসায়ী জীবনে এসে তা প্রতিদিন দেখতে হয়েছে। প্রতারণা, লোক-ঠকানো, নিজের স্বার্থ উদ্ধারে

অন্যকে ব্যবহার। এ রকম কত কী। কিন্তু তাই বলে রাসূল ﷺ ব্যবসা থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেননি। আবার সমাজের মূলধারার সাথে মিশেও যাননি। সমাজের বিবেকহীন চর্চায় লিপ্ত হননি; বরং তিনি ব্যবসার ভালো দিকটাতে নজর দিয়েছেন। খারাপ থেকে দূরে থেকেছেন। আল-সা'ইব নামক সৎ ব্যবসায়ীর সাথে সফল ব্যবসায়িক জুটি গড়ে তুলেছেন। নিজের পণ্যের খারাপ দিকে তিনি অবলীলায় বলে দিতেন। এ ব্যাপারে তাঁর সুনাম ছিল। দাম নিয়ে বাদানুবাদ করতেন না। রাসূল ﷺ আল-সা'ইবের কাছ থেকে শিখেছেন দুর্নীতির হাতছানি যে-সমাজে সুলভ, সেখানেও কীভাবে সৎভাবে জীবিকা উপার্জন করা যায়।

ব্যবসায় রাসূল ﷺ-এর বিশ্বাসযোগ্যতার কারণে, সফল নারীব্যবসায়ী খাদিজা তাঁকে তার হয়ে ব্যবসার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময়ে তাঁর মালামাল সিরিয়াতে বিক্রয় করতে হবে। রাসূল ﷺ রাজি হয়েছিলেন। তিনি সিরিয়া থেকে ভালো লাভ করেন। যেটা তাঁর সততা এবং কেনাবেচায় তাঁর দক্ষতার প্রমাণ দেয়। যে-কারণে খাদিজা প্রতি কাফেলা যাত্রায় তাঁর কমিশন বাড়িয়ে দেন ১৬শ দিরহাম পর্যন্ত। ২০-২৫ বছর বয়সী কারও জন্য এটা খুবই আকর্ষণীয় কমিশন ছিল। সে সময়ে পরোটার দাম ছিল ৬ দিরহাম। উটের জিন ১৩ দিরহাম, ভেড়া ৪০ দিরহাম। উট ৪০০ দিরহাম। ব্যবসায় সফল হওয়ার জন্য ব্যবসায়ীর প্রয়োজন পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়া, দূরদৃষ্টি, অন্যকে আশ্বস্ত করার সামর্থ্য। এগুলো সবই রাসূল ﷺ-এর ছিল।

নিজের সমাজের সাথে মিশুন

সমাজের সুযোগ সুবিধাগুলো থেকে নিজেকে বঞ্চিত করবেন না। মানুষের সাথে মিশুন। পরিবেশ ভালো না, এমন অভিযোগ করে দূরে পড়ে থাকবেন না। আপনি আপনার নিজের উন্নতির জন্য উদ্ভাবনীমূলক উপায় খুঁজুন। নিজের উদ্যোগে যতটুকু পারুন আশপাশ বদলে দিন। রাসূল ﷺ বাজার থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হননি। আবার তাতে ডুবেও যাননি; বরং তিনি তাঁর আদর্শ বজায় রেখেছেন। চলাফেরার জন্য তাঁর মতো মানুষ পেয়েছেন।

বন্ধুবান্ধব

খুব সতর্কতার সাথে রাসূল ﷺ তাঁর বন্ধুদের বাছাই করেছেন। সুশিক্ষিত শ্রদ্ধাবান লোকদের বন্ধু হয়েছেন। আমরা এখন রাসূল ﷺ-এর কিছু বন্ধুবান্ধবদের নিচে তুলে ধরব-

- **আবু বকর আস-সিদ্দীক:** তিনি কখনো মদ খাননি। মূর্তিপূজা করেননি। তারপরও তিনি সামাজিক ছিলেন। সমাজে বেশ জনপ্রিয় ছিলেন।
- **হাকিম ইবন্ হিযামঃ** বুদ্ধিমান ও দানশীল নেতা যিনি হাজিদের মেহমানদারি করতেন।
- **জাব্রো আর-রুমিঃ** সুশিক্ষিত, বহুভাষী খ্রিষ্টান, ধর্মগ্রন্থের প্রতি জ্ঞানের ব্যাপারে যিনি জ্ঞানী ছিলেন। আগেই বলেছি, আল্লাহ তায়ালা তার ব্যাপারে বলেন, 'তারা বলে, 'নবিকে তো কেবল একটা লোক এসব শেখায়'। আন নাহল : ১০৩

রাসূল ﷺ আরব, বিদেশি, মূর্তিপূজারি ও খ্রিষ্টানদের সাথে মিশেছেন। বিভিন্ন বয়সী বন্ধু ছিল তাঁর। যেমন হাকিম তাঁর চেয়ে পাঁচ বছরের বড় ছিল। আবু বকর ছিল দুবছর ছোট। তাঁর বন্ধুবান্ধব সবাই ছিল সম্মানিত ও ভালো মানুষ।

কাদেরকে বন্ধু বানাবেন সে ব্যাপারে বিচক্ষণ হোন। ভালো লোকদের ভালোভাবে চিনুন। আজকাল বন্ধুবান্ধব বানানোর বিষয়টা বদলে গেছে। মূল আকর্ষণ একই আগ্রহের লোকদের সাথে বন্ধুত্ব পাতানোর আইডিয়ার ওপর ভিত্তি করেই তৈরি ফেইসবুক, টুইটার আর লিঙ্কড ইনের মতো সামাজিক যোগাযোগের সাইটগুলো। একজনকে বন্ধু বানালে আরও দশজন বন্ধু হওয়ার দরজা খুলে যায় এখানে। কার সাথে প্রথম দেখা হচ্ছে- শুধু এটাই চ্যালেঞ্জ না। সে যে তার সাথে করে আরও বড় নেটওয়ার্ক নিয়ে আসছে সেটাও চ্যালেঞ্জ। সুতরাং সতর্কতার সাথে আপনার নেটওয়ার্ক বাছাই করুন।

বন্ধু নির্বাচনের সময় যা খেয়াল রাখবেন

- বৈচিত্র্য আনুন। শুধু নিজের বলয়ে সীমাবদ্ধ থাকবেন না।
- সম্পর্ক বাড়ান। প্রতিটা সম্পর্কের মধ্যে ভালো-খারাপ সময় যায়। সম্পর্ক বেশি হলে খারাপ সময়ে একাকী মনে হবে না নিজেকে।
- কারও সাথে বন্ধুত্ব রিভিউ করুন। নিজেকে জিজ্ঞেস করুন এই বন্ধুত্বের কারণে আমি কি আগের চেয়ে ভালো হচ্ছি?

বিয়ে ও পরিবার

আমরা এখন রাসূল ﷺ-এর বিবাহিত জীবন নিয়ে কথা বলব। মুসলিম পাঠকদের কাছে বিষয়গুলো তুলে ধরব। তবে আমরা এখানে দেখব তাঁর বিবাহিত জীবনের কোন কোন দিকগুলো আমাদের বৈবাহিক জীবনে অনুপ্রেরণা দিতে পারে। সম্পর্কে অনুপ্রেরণা হিসেবে ব্যবহার করে আমাদের বিয়েতে স্পার্ক আনতে পারি।

বিয়ের সময় রাসূল ﷺ-এর বয়স ছিল ২৫। খাদিজা (রা)-এর বয়স প্রায় ৪০। এরপরও তিনি আকর্ষণীয় ছিলেন। সমাজে সম্মানিত ছিলেন। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে সফল নারী ব্যবসায়ী ছিলেন।

দাদার বাড়িতে রাসূল ﷺ দুবছর কাটিয়েছিলেন। ১৭ বছর কাটিয়েছেন চাচার বাসায়। আর বিয়ের পর ২৮ বছর তিনি তাঁর স্ত্রীর বাড়িতে ছিলেন। ৫৩ বছর বয়সে যখন তিনি হিজরত করেন তখন এই বাসা ছাড়েন। খাদিজা (রা) তাঁর জীবনে যে কত গুরুত্বপূর্ণ ছিল এ থেকে তা বুঝা যায়।

১৯৮৯ সালে খনন করার কারণে, আমরা এখন খাদিজার বাড়ির বিস্তারিত জানি। এক তলা বাড়ি। দুটো বেডরুম। রাসূল ﷺ আর তাঁর স্ত্রীর জন্য ২০ ফুট বাই ১৩ ফুট মাস্টার বেডরুম। ২৩ ফুট বাই ১৩ ফুটের আরেকটা বাচ্চাকাচ্চাদের জন্য। ৩০ ফুট বাই ১৩ ফুটের আরেকটা রুম ছিল অতিথিদের জন্য। সবচেয়ে বড় রুমটা ছিল ৫২ ফুট বাই ২৩ ফুট। ওটা ছিল খাদিজার ব্যবসায়িক মালামাল রাখার জায়গা। রাসূল ﷺ-ও সেখানে তাঁর মূল্যবান জিনিসপত্র রাখতেন হয়ত।

খাদিজা (রা)-এর বাসায় ২৮ বছর থাকা অবস্থাতেই তাঁর বেশিরভাগ সন্তানের জন্ম হয়। প্রথম অহী তিনি এখানেই পান।[৫]

তবে নিজের সন্তান হওয়ার আগেই রাসূল ﷺ-কে কিন্তু সন্তান পালনের দায়িত্ব পালন করতে হয়েছে। এর আগে খাদিজার দুবার বিয়ে হয়েছিল। এবং সেখানে তার দুজন ছেলে ছিল। নিজের ছেলের মতো রাসূল ﷺ হিন্দকে মানুষ করেছেন। সৎবাবা শুনলে আমাদের সময়ে বাবা নিয়ে যে নেতিবাচক চিত্র মাথায় আসে, তিনি অমনটা ছিলেন না।

স্ত্রীর প্রতি দায়িত্ব আর স্ত্রীর অধিকার থেকে তিনি খাদিজার সাথে আচরণ করেননি; বরং ব্যবহার ছিল নিজের পুণ্যগুণে। বৈবাহিক সম্পর্কের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'তোমাদের মধ্যকার দয়ামমতা ভুলে যেয়ো না'। বাকারা : ২৩৭

দয়াপরবশ হয়েই খাদিজা (রা) রাসূল ﷺ-এর চাচাতো ভাই আলীকে তাদের সাথে রাখতে রাজি হয়েছিলেন। তিনিও তাকে নিজের ছেলের মতো দেখেছেন। এমনকি ফাতিমার সাথে তার বিয়ে হওয়ার পরও। আলীও তাকে মায়ের মতো দেখেছেন। শাশুড়ির মতো না। শাশুড়ি শব্দটাও আজকাল বেশিরভাগ জায়গায় নেতিবাচক চিত্র দেয়। সুখী বিবাহিত জীবনের রেসিপি হলো ভালোবাসা, সম্মান, পারস্পরিক বুঝাপড়া আর দয়ামায়া।

দম্পত্তিদের মধ্যে ভালো পারস্পরিক বুঝাপড়া সন্তানদের মাঝেও ছড়িয়ে যায়। যখন তারা বিয়ে করে তাদের মধ্যেও এটা কাজ করে। রাসূল ﷺ ও তাঁর স্ত্রী যে-পরিবারে ছিলেন, আলী (রা) ও ফাতিমা (রা) তো সে পরিবারেই বড় হয়েছেন। তাদের পরিবারেও ছিল নবি-পরিবারের মতো স্থিতিশীল পরিবেশ। বুঝাপড়া। হাসান ও হুসাইন এমন সুন্দর পরিবেশেই মানুষ হয়েছেন।

হাসান ও হুসাইন (রা) যখন বিয়ে করেছেন, তাদের পরিবারেও ছিল একই চিত্রের প্রতিফলন। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার পারস্পরিক বুঝাপড়া কেবল বারাকাই না, এক অমূল্য উপহার। প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে, সন্তান থেকে নাতিপুতির মাঝে এই উপহার ছড়িয়ে যায়।

নিচের টেবিল থেকে দেখব কীভাবে আজকালকার দম্পত্তিরা রাসূল ﷺ ও খাদিজার বিবাহিত জীবন থেকে শিখতে পারেন, কীভাবে তারা একে অপরের সাথে আচরণ করবেন।

রাসূল ﷺ	স্বামী
রাসূল ﷺ ঘরের কাজকর্মে সহযোগিতা করতেন।	স্বামী ঘরের কাজে সাহায্য করুন। এমনটা ভাববেন না যে এতে আপনার পুরুষ পুরুষ ভাব চলে যাবে।
রাসূল ﷺ কিন্তু প্রচণ্ড ব্যস্ত সময় কাটিয়েছেন। তারপরও সন্তানদের সাথে সম্পর্ক মজবুত করার জন্য অনেক সময় কাটিয়েছেন।	আপনার চাকরি যত চাপেরই হোক না কেন, সন্তানদের সময় দিন। তাদের দেখভালের দায়িত্ব শুধু স্ত্রীর ওপর ছেড়ে দেবেন না।
খাদিজা (রা)-এর পরিবার ও আত্মীয়ের প্রতি রাসূল ﷺ অনেক সহৃদয় ছিলেন। তিনি তার আগের ঘরের সন্তান হিন্দ ও তার বোন হালার দেখভাল করেছেন। খাদিজা (রা)-এর ভাগ্নে হাকিমের সাথে ভালো সম্পর্ক ছিল।	শ্বশুড় বাড়ির আত্মীয়দের সাথে দয়ামায়া রাখুন। আপনি তাদের বাড়িতে বেড়াতে যেতে পারেন, উপহার দিতে পারেন। ভালো আচরণ করতে পারেন। ইত্যাদি।

খাদিজা (রা)	স্ত্রী
ঘরে তিনি শান্ত ও ভালোবাসাময় পরিবেশ তৈরি করেছিলেন। আর তাই তো আল্লাহ তাকে ওয়াদা দিয়েছেন যে, জান্নাতে তার জন্য বিশেষ জায়গা থাকবে।	ঘরে স্বস্তিজনক পরিবেশ তৈরিতে সাহায্য করুন। এটা সবার মধ্যকার সম্পর্ক, মনমানসিকতা আর মেজাজের ওপর ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।
বাসার বাইরে রাসূল ﷺ একাকী সময় নিজের জন্য আলাদা সময় কাটাতেন, এটা নিয়ে তিনি সংশয়ী হননি; বরং তাঁকে সহযোগিতা করেছেন।	আপনার স্বামীর প্রয়োজন বুঝুন। তাকে আরও ভালো হতে সাহায্য করুন। স্বামীরও এমন করা উচিত।
রাসূল ﷺ-এর পরিবার ও আত্মীয়ের ব্যাপারে তিনিও সহৃদয় ছিলেন। তাঁর চাচাতো ভাই আলী ইব্ন্ আবী তালিবকে নিজের ছেলের মতোই দেখেছেন।	যতটা সম্ভব তার পরিবারের প্রতি সদয় হোন। তার বাবা-মাকে শ্রদ্ধা করুন। ভালো আচরণ করুন।

বিশ্বাস ও মূল্যবোধ

আমরা দেখেছি রাসূল ﷺ তাঁর সমাজের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন। সংঘাত সমাধানে চমৎকার প্রস্তাব দিয়েছেন। বিভিন্ন ধর্ম ও শ্রেণির লোকদের সাথে তিনি বন্ধুত্ব করেছেন। আমরা দেখেছি তিনি ঘরে কেমন ছিলেন তাঁর স্ত্রী ও পরিবারের সাথে। সমাজের চাপে নিজের আদর্শকে জলাঞ্জলি দেননি। নিজের বিশ্বাস নিয়ে তিনি ছিলেন স্বাধীনচেতা। শক্তিশালী মানুষ।

রাসূল ﷺ তাঁর সমাজের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। তবে তাই বলে সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠের ধর্মবিশ্বাস অন্ধের মতো গ্রহণ করেননি। এমন কোনো প্রয়োজন অনুভব করেননি। তিনি মদ খাননি। জুয়া খেলেননি। কুরআন যেমনটা বলেছে তিনি ছিলেন 'উত্তম চরিত্রের পরাকাষ্ঠা'। এর ব্যত্যয় ঘটে এমন কিছু করেননি।

আসলে, তাঁর ধর্মবিশ্বাস সেসব সংখ্যালঘু ধার্মিকদের কাছাকাছি ছিল যারা এক আল্লাহকে বিশ্বাস করত। আবার এটাও কিন্তু অন্ধঅনুকরণের কারণে না। যেমন কিছু মানুষ কৌতূহলবশে অন্যান্য ধর্ম পরখ করে দেখে; বরং কিশোর বয়সে বাহিরা সন্ন্যাসীর সাথে তাঁর সেই কথোপকথন থেকে বুঝা যায়, তখনকার সেই বিশ্বাস বাড়তে বাড়তে এই অবস্থায় এসেছে।

ধর্মচর্চা

নবি হওয়ার আগে রাসূল ﷺ কোনো ধরনের ইবাদত করতেন কিনা সে ব্যাপারে তেমন জানা যায় না। মক্কার একেশ্বারবাদী ও বহুঈশ্বরবাদীরা যেসব উপাসনা করত, তার মধ্যে কিছু ছিল এক। যুগ যুগ ধরে নবি ইবরাহীম (আ) যেসব উপাসনা করতেন সেগুলোরই কিছু রূপ অবশিষ্ট ছিল। এগুলোর মধ্যে ছিল-

- **প্রার্থনাঃ** হাঁটুগেড়ে বসা এবং সিজদা করা। একেশ্বরবাদী যাইদ ইব্‌ন্ আমর এ ধরনের সিজদা করতেন বলে জানা যায়। সিজদায় তিনি বলতেন, 'ইবরাহীম যার কাছে আশ্রয় চাইতেন, আমিও তাঁর কাছে আশ্রয় চাই'।

- **উপবাস:** কুরাইশরা মুহাররাম মাসের দশ তারিখ উপবাস থাকত।
- **হজ্জ:** রাসূল ﷺ কাবা তাওয়াফ করেছেন। সাফা-মারওয়া পাহাড়ের মধ্যে হেঁটেছেন। আরাফাতের ময়দানে দাঁড়িয়েছেন। এগুলো সবই হজ্জের অংশ। তবে যেসব ধর্মীয় রীতিগুলো স্পষ্টভাবে কুরাইশদের ছিল, তিনি সেগুলো করেননি।
- **নির্জন সময় কাটানো:** কুরাইশরা কখনো কখনো নির্জনতায় যেত প্রার্থনা করার জন্য। ইসলামে আসার আগে ওমর ইবনুল খাত্তাব কাবায় যেয়ে নির্জনে সময় কাটাতেন।

যেগুলোকে তিনি ইবরাহীম (আ)-এর ধর্মের অংশ দেখেছেন, সেগুলো নিয়েছেন। এগুলো পরে ইসলামে নিয়ে নেওয়া হয়।[৬]

চিন্তাভাবন ও ব্যস্ত জীবন

রাসূল ﷺ নিজের জন্য কিছু সময় আলাদা করতেন। পরিবার ও সবার থেকে দূরে, মক্কার প্রান্ত থেকে ৩ কিলোমিটার দূরে এক পর্বত গুহায়। সাথে থাকত শুধু খাবার। সেখানে তিনি প্রতিদিন কী করতেন, তা নিয়ে কোনো রোজনামচা বা ডাইরি নেই। তবে তিনি নিজের ধ্যানধারণা, চিন্তাভাবনা, অনুভূতি নিয়ে ভাবতেন। কখনো কখনো স্থিরদৃষ্টিতে কাবার দিকে তাকিয়ে থাকতেন। কারণ, অত উঁচু পাহাড় থেকে সহজেই কাবা দেখা যেত। পর্বতগুহাটি হেরা অথবা আলোর পাহাড় নামে পরিচিত। সাগরপৃষ্ঠ থেকে এর উচ্চতা ৬২০ মিটার। ছোট একটা ফাটলমুখ দিয়ে গুহায় ঢুকতে হতো। ভেতরে একজন মানুষ দাঁড়ানো তো দূরের কথা, কোনোমতে শুতে পারবে এমন জায়গা। অথচ এমন জায়গাতেই রাসূল ﷺ একমাস নাগাদ কাটিয়েছেন। জায়গাটি ছিল নিস্তব্ধ। রাতে আরও বেশি।

নিজের জন্য সময়

ঘুপচি এক গুহায় একাকী দুনিয়া থেকে আলাদা হয়ে থাকা কোনো মজার কাজ বলে বেশিরভাগ লোকেরই মনে হবে না। ঘরে কিংবা মসজিদে নির্জন সময় তা-ও কাটানো যায়। কিন্তু লোকালোয় থেকে এমন জনমানবহীন জায়গায় ভাবাই যায় না এখন। কিন্তু রাসূল ﷺ নিয়মিত তা করেছেন।

একসময় বছরে পুরো এক মাস। ভয় পাননি। একঘেয়ে লাগেনি। কারণ তাঁর মধ্যে গভীর ভাবনায় ডুবে যাওয়ার সামর্থ্য ছিল।

আজকের যুগে এমন মানুষ পাওয়া দুর্লভ। গোটা দুনিয়া আজ নেটওয়ার্কের আওতায়। এখন একা থাকা মানে কম্পিউটার বা স্মার্টফোনের ধাঁধানো স্ক্রিনে তাকিয়ে থাকা। চিন্তাভাবনার উদ্দেশ্যে নির্জনে থাকা এর থেকে পুরো আলাদা।

কেউ আবার ভুল বুঝবেন না যে, আপনাদেরকে সমাজ ছেড়ে একঘরে হয়ে যেতে বলা হচ্ছে। রাসূল ﷺ বেশ ভালোভাবেই তাঁর সমাজের অংশ ছিলেন। আমরা আগে দেখেছি; বরং, নিজের জন্য নির্জনে কাটানোর সময় বের করুন ভাবনাচিন্তা করার জন্য।

মোবাইল ফোন আমাদের মনোযোগ দেওয়ার ক্ষমতাকে গিলে ফেলেছে। কোথায় নেই সে। গাড়ি দুর্ঘটনার কারণ থেকে শুরু করে মসজিদে সালাতরত অবস্থায় টাং করে বেজে ওঠা। সবজায়গায় সে। গোটা পরিবার এক ছাদের নিচে, কিন্তু সবাই যে যার মতো মুঠোফোন নিয়ে মশগুল।

রাসূল ﷺ-এর উদাহরণ থেকে অনুপ্রাণিত হোন। কীভাবে তিনি একাকী বা একঘেয়ে না-হয়েও নির্জনতা উপভোগ করেছিলেন। স্মার্টফোন, ইন্টারনেটের মতো সবধরনের বাগড়া থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করুন। এরপর কমপক্ষে এক ঘণ্টা ভাবনাচিন্তা করুন। নিজের ভেতরটাকে জানুন।

আমরা এই অধ্যায়ের শেষে চলে এসেছি। আমরা বলেছি কীভাবে তিনি গভীরভাবে সমাজের সাথে জড়িত ছিলেন সমস্যার সমাধানে। খাদিজা (রা)-এর সাথে বিয়ের মূল প্রেরণা ছিল মমতা ও দয়া। বলেছি তিনি কেমন স্বাধীনচেতা ও চিন্তাপ্রবণ মানুষ ছিলেন।

নিচের টেবিল আপনাকে স্মরণ করিয়ে দেবে রাসূল ﷺ-এর তরুণ ও যুবক বয়স থেকে আপনি কী কী গুরুত্বপূর্ণ উপকার পেতে পারেন-

যুবক-তরুণ বয়সে রাসূল ﷺ-এর জীবন থেকে শিক্ষা	
রাসূল ﷺ-এর জীবন	আপনার জীবন
সমাজ	
তিনি ইতিবাচক ছিলেন। সমাজে সক্রিয় ছিলেন। সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ নিয়েছেন। যেমন- ‘মর্যাদাবানদের সংঘ’-তে যোগদান।	বয়স যা-ই হোক, ভূমিকা রাখার পরিমাণ যা-ই হোক, ইতিবাচক হোন। উদ্যোগ নিন।
সমস্যা সমাধানে তিনি ছিলেন বেশ সৃষ্টিশীল যেমনটা আমরা কালো পাথর রাখা নিয়ে দেখেছি।	সৃজনশীল হোন। আপনি যে মহৎ সমাধান নিয়ে এগিয়ে আসতে পারেন। এটাকে নিচুজ্ঞান করবেন না।
তিনি ছিলেন খোলা-মনের মানুষ। বিভিন্নজনদের থেকে মর্যাদাবান ও ভদ্র লোকদের সাথে বন্ধু হয়েছেন।	খোলা-মনের হোন। আপনার যোগাযোগের বলয় বাড়ান। যারা আপনাকে অনুপ্রাণিত করবে তাদের সাথে সম্পর্ক গড়ুন।
বিয়ে	
রাসূল ﷺ-এর সুখী বৈবাহিক জীবনের ভিত্তি ছিল পারস্পরিক বুঝাপড়া ও মায়ামমতা।	আপনার সঙ্গীর প্রয়োজন ও অনুভূতির কথা বিবেচনা করে বিয়ের জন্য আগান। শুধু অপরের অধিকার ও কর্তব্য ভেবে না।
রাসূল ﷺ	নিজে
তিনি ভাবনাচিন্তার জন্য নির্জনতা বেছে নিয়েছিলেন। বছরের একটা নির্দিষ্ট সময় জনমানবহীন জায়গায় কাটাতেন। ভাবনাচিন্তা করতেন।	আপনার জীবনের মিশন নিয়ে ভাবনাচিন্তা করুন। ভাবুন এখন কী অবস্থায় আছেন, আর কী হতে চান।

চল্লিশের কোঠায় রাসূল ﷺ

আমাদের জীবন অনেক দ্রুত বদলায়। পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার অভিযোজ্যতা আমাদের মনমানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গীর মূল্যবান স্বভাব। পরিবর্তনের যে গুরুত্ব আছে তা কিন্তু বেশিরভাগ লোকই বুঝে। কিন্তু বদলাতে পারে না। তারা ভয় পায় আরামের জায়গা ছেড়ে অনিশ্চয়তাময় পুরোপুরি নতুন ও অপরিচিত জায়গাকে। চল্লিশে পৌঁছে রাসূল ﷺ বড়সড় পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যান। যেটা বদলে দিয়েছে তাঁর, তাঁর বন্ধুবান্ধব, সমাজের জীবন। এই সময়টাতে তিনি একাধারে প্রত্যাদেশ বা অহী পেতে থাকেন। মক্কা ছেড়ে মদিনায় বসতি গড়েন। পরিবর্তন একটা প্রক্রিয়া। কোনো ঘটনা না। এতে প্রয়োজন ধৈর্য, নিবেদন ও চর্চা।

পরিবর্তনের সাথে মানিয়ে নেওয়া

রাসূল ﷺ-এর শিশুকাল ছিল মানসিক বিকাশ ও আবেগ ভালোবাসার। কৈশোরে তিনি তাঁর প্রাণশক্তি ব্যবহার করেছেন অভিজ্ঞতা অর্জনে। যুবক বয়সে তিনি তাঁর সেসব অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়েছেন সমাজসেবায়। ৪০ বছর বয়সে তিনি বড়সড় পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যান। অপ্রত্যাশিত ঘটনা সামলাতে শেখেন।

এই অধ্যায়ে আমরা প্রায়ই 'পরিবর্তন' বা 'বদল' শব্দদুটো দেখব। কারণ এ সময়টাতে তিনি নিজে তো বটেই; পরিবার, বন্ধুবান্ধব অনেকের পরিবর্তন দেখেছেন।

এই অধ্যায়ে আমরা কথা বলব, চল্লিশের কোঠার রাসূল ﷺ-এর জীবন নিয়ে। সেই সঙ্গে যারা তাঁর পাশে ছিলেন, তাদের অনুপ্রেরণামূলক কাহিনিগুলোও বলব।

পরিবর্তন সহজ না। এজন্য প্রশিক্ষণ দরকার। এই অধ্যায়ের আরেকটি মূলশব্দ 'পরিবর্তন'। কেউ কেউ পরিবর্তনের জন্য প্রশিক্ষণের গুরুত্বকে খাটো করে দেখেন। মনে করেন, তথ্য শুষে নিলেই বুঝি আপনাআপনি মানুষ বদলে যায়; বরং এজন্য প্রয়োজন যেকোনো পরিবর্তনের পর নতুন সময়ের সাথে অভ্যস্ত হওয়ার জন্য নিজের আচরণকে খাপ খাইয়ে নেওয়া।

এই অধ্যায়ে আমরা আরও দেখব, কোন কোন কারণ মানুষকে পরিবর্তনের জন্য তাড়া দেয়। বিশেষভাবে দেখব সেই সব প্রভাব সৃষ্টি করা পরিস্থিতিগুলো, যেগুলো মানুষের মাঝে পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তোলে। রাসূল ﷺ-এর ডাকে বদলে যাওয়া অনেক মানুষের কাহিনি শুনব। আমরা পরিবর্তনের গুরুত্ব নিয়ে কথা বলব। সেই সাথে পরিস্থিতির দাবি অনুযায়ী বদলে যাওয়া, অকেজো অভ্যাস ছেড়ে দেওয়া এবং যেটা বাস্তবতার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে বাধা তৈরি করতে পারে, সেগুলো নিয়েও কথা বলব।

আমরা আরও দেখব, মক্কায় অবতীর্ণ হওয়া কুরআনের আয়াতগুলোতে প্রথম দিকের কনভার্টেড মুসলিমদের পরিবর্তনের ধারা ও কার্যকারণ। কেমন করে এ আয়াতগুলো তাদের হৃদয় নাড়িয়ে দিয়েছিল? না-বদলানো মূর্তিপূজারীদেও কথাও শুনব। কেনই-বা তারা বদলাতে চায়নি, তাও জানব।

কেন সাধারণভাবে বেশিরভাগ লোক বদলে যেতে ভয় পায়, বা বদলানোর চিন্তাকে বাতিল করে দেয়? আমাদের কিছু অভ্যাস, পরিবেশ নিজেদের বদলানোর পথে বড় বাধা। প্রয়োজনে এসব অভ্যাস আর পরিবেশও ছেড়ে দিতে হয়। রাসূল ﷺ যে মক্কা ছেড়ে মদিনায় গেলেন কেন? আসুন জেনে নিই।

৪০ বছরে পরিবর্তন

চল্লিশ বছর বয়সকে মানুষের জীবনের পালাবদলের সময় ধরা হয়। এ বয়সের উল্লেখ করে মহান আল্লাহ বলেন,

> 'যখন সে বলিষ্ঠ হয়, চল্লিশ বছরে পৌছে তখন বলে, 'প্রভু, আমাকে, আমার বাবা-মাকে যে-অনুগ্রহ দিয়েছেন, সেজন্য কৃতজ্ঞতা আদায় করার সামর্থ্য দিন'। আহকাফ : ১৫

৪০ বছর বয়সে হওয়া রাসূল ﷺ-এর জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন শুরু করব। পর্বত গুহায় রাসূল ﷺ চিন্তামগ্ন। হঠাৎ করে অভূতপূর্ব একটা ব্যাপার ঘটে গেল। মহান আল্লাহর এক বার্তাবাহক (ফেরেশতা) তাঁর সামনে এসে বললেন, 'পড়'! রাসূল ﷺ ভীষণ ভয় পেলেন। তিনি বার বার বলছিলেন, তিনি পড়তে জানেন না। আতঙ্কে তাঁর কথা জড়িয়ে যাচ্ছিল। ফেরেশতা তাঁকে খপ করে ধরে প্রচণ্ড জোরে ঝাঁকি দিলেন। আবার বললেন, 'পড়'! রাসূল ﷺ-এর সামনে পড়ার মতো কিছুই ছিল না যদিও। রাসূল ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, 'কী পড়ব'? ফেরেশতা আবার তাঁকে ঝাঁকি দিয়ে বললেন, 'পড়'! রাসূল ﷺ আবারও বললেন যে তিনি অক্ষরজ্ঞানহীন। পড়তে জানেন না। ফেরেশতা শেষবারের মতো তাঁকে ঝাঁকি দিলেন। এবার এত জোরে যে তাঁর মনে হলো আত্মা বুঝি দেহ থেকে বের হয়ে যাবে। তিনি আবার বললেন, 'পড় তোমার সেই প্রভুর নামে যিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন'। আল আ'লাক : ১

ফেরেশতা জিবরাঈলের সাথে রাসূল ﷺ-এর এই ঘটনার পর তাঁর জীবন খোলনলচে বদলে গিয়েছিল। পর্বত গুহায় রাসূল ﷺ-কে শারীরিকভাবে যন্ত্রণাময় পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। ফেরেশতা জিবরাঈল তাঁকে কঠিনভাবে চেপে ধরেছিলেন। কিন্তু তারপরও তিনি তাকে আবার দেখার জন্য উদগ্রীব ছিলেন। লম্বা সময় ধরে তিনি যদি না-আসতেন তাহলে চিন্তিত হয়ে পড়তেন।

পরিবর্তন আমাদের সবার জন্য প্রচণ্ড কঠিন বা যন্ত্রণাময় হতে পারে। কারণ, এটা একজন মানুষকে আরামের জায়গা থেকে হ্যাঁচকা টান দিয়ে অপরিচিত জায়গায় নিয়ে যায়। কিন্তু একবার যখন সে নতুন পরিস্থিতির সাথে মানিয়ে নেয়, তখন আর ব্যথা থাকে না। মানুষ আসলে পরিবর্তন নিয়ে দোনমনা করে না, তারা আসলে পরিবর্তনের সাথে আসা কষ্টকে ভয় পায়।

আপনাকেও কষ্ট সহ্য করার জন্য তৈরি থাকতে হবে। দিনশেষে এগিয়ে থাকার জন্য মূল্য দিতে হবে। বড় কোনো পরিবর্তন ফ্রি ফ্রি আসে না।

রাসূল ﷺ খুব দ্রুত সাতজন মানুষের জীবন বদলে দিতে পেরেছিলেন। তাঁর স্ত্রী খাদিজা (রা) (৫৫ বছর), তাঁর কন্যা যাইনাব (রা), রুকাইয়া (রা) ও উম্মু কুলসুম (রা); তাঁর চাচাতো ভাই আলী ইবনে আবু তালিব (রা) (১০ বছর); সে-সময়ে তাঁর পালকপুত্র (পালকপুত্রে বিধান পরে বাতিল হয়ে যায়) যায়েদ ইবনে হারিসা (রা) (৩০ বছর); তাঁর বন্ধু আবু বকর (রা) (৩৮ বছর)।

আবু বকর (রা) আরও পাঁচজন লোককে বদলে দিয়েছিলেন। ওসমান ইবনে আফ্ফান (রা) (৩৪ বছর), আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা) (৩০ বছর), তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ, সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা) (১৯ বছর), আয যুবাইর ইবনে আল আওওয়াম (রা) (১৬ বছর)।

মজার বিষয় হচ্ছে, এই লোকগুলোর মধ্যে পরিবর্তন এত দ্রুত কীভাবে হলো? সাধারণভাবে মানুষের মাঝে আইডিয়াগুলোই বা কীভাবে ছড়ায়?

লিডারশিপ ও ম্যানেজমেন্ট থিউরিতে 'কানেক্টর' নামে একটা কথা আছে। এরা জানেন কীভাবে মানুষের সাথে লিংক করতে হয়। এরা একজন থেকে আরেকজনে অনুপ্রেরণা ও উদ্দীপনামূলক আইডিয়া নিয়ে যায়। আজকের সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমগুলো ঠিক যেভাবে করে। এ ধরনের লোকদের মাধ্যমে আইডিয়া সফলভাবে ছড়ায়।

আবু বকর আস সিদ্দিক (রা) এখানে একজন কানেক্টর। তিনি বিভিন্ন বয়সের বিভিন্ন ব্যাকগ্রাউন্ডের লোকদের সাথে সম্পর্ক রাখতেন। যেমন সা'দ ছিলেন টিনএজ বয়সী। অন্যদিকে ওসমান (রা)-এর বয়স ছিল ৩৪।

পরিবর্তনের আইডিয়াতে যারা আশ্বস্ত হয়েছিলেন, দ্রুতই তাদের সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে যায়। ১৩ থেকে ২০। এরপর ৩০। প্রথম দিকের ইসলামি ইতিহাসবিদ ইব্‌ন্ হিশাম এমনটাই বর্ণনা করেছেন।[১]

আমরা এখন এমন কিছু লোকদের ব্যাপারে জানব, যারা তাদের জীবন বদলে ফেলেছিলেন (এক্ষেত্রে ইসলামে ফিরে এসেছিলেন)। আপনারা যারা নিজেদের জীবন বদলাতে চাচ্ছেন তাদের জন্য এই অভিজ্ঞতাগুলো নতুন কিছু দিতে পারে।

আমরা বিশেষ করে তাদের দিকে নজর দেব, যারা নিজেদের পরিবর্তনের অভিজ্ঞতা নিয়ে কথা বলেছেন। আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে তাদের কাহিনি জানব, যাতে আমাদের বাস্তবতার সঙ্গে মেলাতে পারি।

আমর আস সুলামী (রা)

আমর (রা)-এর দ্রুত বদলে যাওয়া বেশ চমকপ্রদ ব্যাপার। রাসূল ﷺ-এর সাথে খুব সংক্ষিপ্ত এক আলাপের পর তিনি তার জীবন পুরোপুরি বদলে ফেলেন। তাদের আলাপের শুরু হয়েছিল এভাবে-

- কে আপনি?
- আমি নবি।
- নবি কী?
- আমাকে আল্লাহ পাঠিয়েছেন।
- কেন তিনি পাঠিয়েছেন?
- আত্মীয়তার সম্পর্ক জুড়তে, মূর্তি ভেঙে গুড়ো গুড়ো করতে, মহান আল্লাহর একত্ব ঘোষণা করতে।
- ঠিক আছে, আমি আপনাকে অনুসরণ করব।

এই আলাপচারিতার সবচেয়ে অবাক করা বিষয় হলো, আমর কী অসম্ভব দ্রুত বদলে ফেলেছিলেন নিজেকে! একটা কারণ হতে পারে যে, ইসলামের আগে তিনি তাওহিদবাদী ছিলেন। কাজেই রাসূল ﷺ যখন মূর্তি ভেঙে গুড়ো গুড়ো করার কথা বললেন, সেটা তার কাছে বোধগম্য হয়েছে, গ্রহণযোগ্য হয়েছে। কিন্তু আরবের অনেকে তাওহিদবাদীই রাতারাতি বদলে যাননি। এক্ষেত্রে আমরের বেলায় কোথায় আলাদা কিছু ছিল?

কেউ কেউ বলতে পারেন, এটা আল্লাহর তরফ থেকে পথনির্দেশ। কিন্তু আরও কিছু মূল ফ্যাক্টর ছিল এই আলাপে যা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। একটা ফ্যাক্টও ছিল, অন্যের সাথে কথা বলার সময় রাসূল ﷺ-এর আশ্বস্ত করার সামর্থ্য। সফল আলাপচারিতায় শুধু মুখের কথার বাইরেও অনেক ব্যাপারস্যাপার থাকে। যেমন- রাসূল ﷺ-এর আন্তরিক মুখভঙ্গী, কণ্ঠে দরদ, প্রাণবন্ত দেহভঙ্গিমা- যা আমরা এই সংলাপ পড়ে উপলব্ধি করতে পারছি না।

জুদি বার্গুন (Judee Burgoon) ১৯৯৬ সালে এক গবেষণায় দেখিয়েছেন, শুধু মুখের অঙ্গভঙ্গী দিয়ে ২০ হাজার ভিন্ন ভিন্ন হাবভাব প্রকাশ করা যায়।

আর মুখের হাবভাব মিথ্যা বলে না। ১৯৬৭ সালে উকলা (UCLA) গবেষণা থেকে বলা হয়েছে যে, ৯৩ ভাগ যোগাযোগই অবাচনিক (৫৫ ভাগ শারীরিক নড়াচড়া থেকে, ৩৮ ভাগ কণ্ঠস্বর থেকে), মাত্র সাতভাগ আসে শব্দ বা কথা থেকে।

রাসূল ﷺ-এর এক সমসাময়িক ব্যক্তি তাঁর ব্যাপারে বলেছেন, 'তাঁর চেহারা দেখেই বুঝেছি, কোনো মিথ্যুকের চেহারা এমন হতে পারে না'।

আমর ও অন্যান্যরা কীভাবে দ্রুত বদলে গিয়েছিল সেটা বুঝার জন্য রাসূল ﷺ-এর কথা বলার স্টাইল খেয়াল করুন। কল্পনা করার চেষ্টা করুন অন্যের সাথে কথা বলার সময় তাঁর মুখভঙ্গী, কণ্ঠ, দেহভঙ্গী।

এবার আমর (রা)-এর সাথে রাসূল ﷺ-এর আলাপের শেষ অংশ দেখি:

- আমি আপনাকে অনুসরণ করব।
- আজকে পারবেন না। দেখছেন না, আমি এবং আমার লোকেরা কী অবস্থায় আছি? আপনি আপনার লোকদের কাছে ফিরে যান। যদি শোনেন আমি এসেছি, তাহলে আমার কাছে আসবেন।

এই ঘটনার আরেকটি নজরকাড়া দিক হচ্ছে, রাসূল ﷺ-কে না-দেখেই দশ বছরেরও বেশি সময় আমর মুসলিম ছিলেন। এরপর আবার রাসূল ﷺ-কে দেখেন যখন তিনি মদিনায় বসতি গড়েন।

হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী, তিনি যখন শুনলেন রাসূল ﷺ মদিনায় এসেছেন, তখন তাকে জিজ্ঞেস করলেন,

- 'আমাকে চিনতে পারছেন'?
- 'হ্যাঁ। মক্কায় দেখা হয়েছিল আপনার সাথে'।

ক্ষণিকের সেই আলাপচারিত কতটা ছাপ ফেলেছিল সেটাও এখান থেকে বুঝা যায়।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)

মক্কার পূর্ব দিকে ৪৫ কিলোমিটার দূরে হুযাইল নামক জায়গা থেকে আবদুল্লাহ এসেছিলেন। শৈশব থেকেই তিনি এখানে মেষ চড়াতেন। একবার তিনি যখন মেষ চড়াচ্ছিলেন, তখন রাসূল ﷺ তাঁর পাশ দিয়ে গেলেন। ভেড়ার দুধ খেতে চাইলেন। আবদুল্লাহ দুঃখ প্রকাশ করে বললেন, তিনি পারবেন না, কারণ ভেড়াগুলো তার না। রাসূল ﷺ তখন তাকে বললেন কমবয়সী একটা ছাগল

নিয়ে আসতে। তিনি কুরআনের একটা আয়াত পড়লেন, ছাগলের ওলান দুধে ভরে উঠল। রাসূল ﷺ ও আবদুল্লাহ পিয়াস মিটিয়ে খেলেন। আবদুল্লাহর জন্য এটাই তার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল।

মানুষ কীভাবে বদলায়?

আবদুল্লাহ ও আমর দুজনের বেলাতেই আসল প্রশ্ন হচ্ছে, কীভাবে ও কেন কিছু লোক রাতারাতি পুরোই বদলে যায়। মহান আল্লাহর পথনির্দেশ তো ছিলই, রাসূল ﷺ তাদের অনুভূতির ওপর বড় ধরনের নাড়া দিতে পেরেছিলেন।

চিপ (Chip) ও ড্যান হিথ (Dan Heath) এই যুক্তি তুলে ধরেছেন যে, বুদ্ধিবৃত্তিক পর্যায়ে নাড়া পড়লে মানুষের বিশ্বাস ও অভ্যাস যতটা বদলায়, তারচেয়েও বেশি বদলায় মানুষ যখন তার আবেগের পর্যায়ে নাড়া খায়।

এর মানে এই না যে, যুক্তি মানুষকে বদলাতে পারে না। যুক্তি ও আবেগ দুটোই কাজ করে। তবে পরিবর্তনের বেলায় এদুটোর যেটার আধিপত্য বেশি সেটাই পরিবর্তনের প্রকৃতির ওপর বেশি প্রভাব ফেলবে।

যুক্তিচিন্তা মানুষের মধ্যে যে-পরিবর্তনগুলো আনে সেগুলো খুব নির্দিষ্ট। স্পষ্ট। যেমন- আপনি যখন আপনার খরচের হাত কমাতে চান এবং বেতনের দশ ভাগ জমাতে চান, তখন এাঁ বুঝা যায় যে পাঁচবছর পর আপনি একটা ফ্ল্যাট কেনার জন্য এমন করছেন।

যৌক্তিক এই পরিবর্তন একটা ক্রমধারা মেনে হয় চলে। আর তা হচ্ছে, 'বিশ্লেষণ-চিন্তা-পরিবর্তন' বা (Analyze-Think-Change)'। অন্যদিকে যে পরিবর্তন আবেগে দোলা দিয়ে আসে সেটার ক্রমধাপ আলাদা। 'দেখা-অনুভব-পরিবর্তন' বা '(See-Feel-Change)। বড় ধরনের ব্যাপক পরিবর্তনে এটা প্রায়ই দেখা যায়।

ড্যান আর চিপ হিথ লিখেছেন,

> 'সাধারণত এমন হয় না যে, না-বুঝার কারণে মানুষ বদলাতে পারেনি। ধূমপায়ীরা জানে সিগারেট স্বাস্থ্যের জন্য খারাপ, কিন্তু তাও ছাড়ে না। কিছুটা হলেও আমরা তাদের এই অবস্থা বুঝতে পারি। কীভাবে করতে হবে এটা জানা, আর করার জন্য উদ্দীপ্ত হওয়া এদুটোর মধ্যে যে পার্থক্য আছে, তা আমরা জানি। কিন্তু অন্যের আচরণ পরিবর্তনের বেলায় প্রথমেই আমাদের মাথায় আসে তাকে কিছু শেখাতে হবে'।[২]

আবেগের কারণে বদলে গেছেন এমন আরও নজির আছে। এর কারণ, তারা যা দেখেছেন বা শুনেছেন তা তাদের ভালোর দিকে বদলে যেতে প্রবলভাবে আলোড়িত করেছে।

দাউস গোত্রের একজন নেতা তুফাইল আমর। মক্কার দক্ষিণে আল বাহা নামক জায়গায় তিনি থাকতেন। রাসূল ﷺ-কে তিনি কুরআনের কিছু আয়াত তেলাওয়াত করতে শোনেন। আর তাতেই তার হৃদয়ে শিহরণ বয়ে যায়। তিনি বলতে বাধ্য হন, 'আমার জীবনে এর চেয়ে ভালো কিছু শুনিনি কখনো'।

তিনি ইসলামে আসার পর তার পরিবারসহ আরও ৭০ জনকে ইসলাম গ্রহণে রাজি করান। আল কুরআনের শব্দ আর রাসূল ﷺ-এর বাচনভঙ্গি দুটোই বেশ শক্তিশালী ছিল।

দিম্মাদ সালাবা ছিলেন প্রসিদ্ধ ডাকিনিবিদ। জিনের আসর ও জাদুটোনা থেকে মানুষকে মুক্ত করতেন। তার পরিবর্তন ছিল পুরো ১৮০ ডিগ্রি। তিনিও রাসূল ﷺ-এর মুখে কুরআন পাঠ শুনে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। বলেছেন, 'একরম কথা তো কোনো দিন শুনিনি'।

আবু যর (রা) ছিলেন গিফার অঞ্চলের তাওহিদবাদী। মক্কা থেকে ২৫০ কিলোমিটার উত্তরে গিফার। রাসূল ﷺ-এর সাথে দেখা করে জায়গায় দাঁড়িয়েই ইসলামে প্রবেশ করেন। কুরাইশ বা অন্যরা কী করবে না-করবে এ নিয়ে তার কোনো মাথাব্যথা ছিল না। হাদীসে পাওয়া যায়, ইসলাম গ্রহণের কারণে একদল মূর্তিপূজারি দুষ্কৃতিকারীরা তার ওপর হামলা করেছিল।

এই তিনজন মানুষের প্রত্যেকের বেলায় কমন ব্যাপার হচ্ছে পরিবর্তনের চিন্তার ব্যাপারে তাদের খোলামন। পরিবর্তনের ব্যাপারে যাদের মন বন্ধ, তারা একে তাদের জন্য হুমকি হিসেবে দেখবে।

বদলে যাওয়ার পর কী কী বদলাতে হবে (যেমন অভ্যাস, স্মৃতি ইত্যাদি) সেগুলোতে তাদের নজর ছিল না; বরং পরিবর্তনের পর নতুন যে-জীবনব্যবস্থায় তারা কাটাবেন, সেদিকে তাদের খেয়াল ছিল।

পরিবর্তনের সাথে মানিয়ে নেওয়া

অন্য শতাব্দীগুলোর সাথে একুশ শতাব্দীর সবচেয়ে বড় পার্থক্য দ্রুত পরিবর্তনশীলতা। টেলিফোন থেকে মোবাইল, এনসাইক্লোপিডিয়া থেকে

উইকিপিডিয়া, ইটপাথরের মার্কেট থেকে অনলাইন শপিং আরও কত কী! যে কারণে পরিস্থিতির দাবি মেনে বদলে যাওয়া আর মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা বর্তমানে গুরুত্বপূর্ণ দক্ষতা।

পরিস্থিতির দাবি মেনে বদলে যাওয়া মানে শুধু নতুন নতুন জিনিস শেখা না। যেসব জিনিস এখন আর কাজে লাগে না, সেগুলো ভুলে যাওয়াটাও এর মধ্যে পড়ে।

ভুলে যাওয়া কঠিন। সবাই তা পারে না। বিশেষ করে নির্দিষ্ট একটা বয়সে পৌঁছার পর। ভুলে যাওয়ার জন্য পরিবর্তনকে বরণ করতে হয়। একে সামলানোর আত্মবিশ্বাস লাগে। প্রফেসর বিল লুকাস বলেছেন,

> 'আজকের জমানায় টিকে থাকতে হলে প্রতিভার ব্যাপারে ভিন্ন চোখ গড়তে হবে। আইকিউয়ের মতো সংকীর্ণ ধরনের বুদ্ধিমত্তার ধরা বাঁধা ধারণার ওপর নির্ভর করার দিন আর এখন নেই। সামনের দিনগুলোতে দিনে দিনে আমরা আগ্রহী হবো মানুষের মন কীভাবে কোনো জিনিস ভুলে যাওয়ার দিকে যাচ্ছে সেদিকে। যাতে বিভিন্ন পরিবেশে লাগাতার সে তার বুদ্ধিমত্তা বাড়াতে পারে'।[৪]

ভুলে যাওয়ার এই সামর্থ্যই তুফাইল ও দিম্মাদের অভিজ্ঞতার অনুপ্রেরণামূলক দিক। পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জের ব্যাপারে তুফাইল ছিলেন আত্মবিশ্বাসী। 'আমি খারাপ থেকে ভালো আলাদা করতে পারি। এই লোকের কথা আমি কেন শুনব না'?

দিম্মাদ ছিলেন ডাকিনিবিদ। কিন্তু সত্য চেনার পর অতীতের এই বিদ্যা ভোলার জন্য তিনি পুরোপুরি প্রস্তুত ছিলেন। 'আমি জ্যোতিষী, জাদুকর, কবিদের কথা শুনেছি। কিন্তু এমন কথা আমি জীবনে শুনিনি'।

পরিবর্তনের বেলায় অনেকের চ্যালেঞ্জ হলো, পরিচিত ও আরামদায়ক কিছু ছেড়ে পুরোপুরি নতুন ও অপরিচিত কিছু হাতে নেওয়া। আবু যর (রা)-এর বেলাতে তা-ই হয়েছিল। কাফেলা আর সফরকারীদের লুট করাই ছিল তার কাজ। কিন্তু সেটা পুরোপুরি ছেড়ে দিয়ে নতুন জীবন রীতি গ্রহণ করেছিলেন।

যত ইচ্ছাই থাকুক, অভ্যাস ছেড়ে দেওয়া সবসময় কঠিন। কারণ অতীত স্মৃতি হৃদয়ে কড়া নাড়তে পারে। কিন্তু নতুন ও অপরিচিত কিছুর সাথে স্মৃতিকাতরতার কিছু নেই।

তবে আবু যর (রা) তার পুরোনো সুখ (দ্রুত টাকা, লুট করে নিজের ক্ষমতা জাহির) ছেড়ে দিতে পেরেছিলেন। ভবিষ্যতের দিকে চিন্তার মোড় ঘুরিয়েছিলেন (যেমন- কীভাবে কুরাইশদেরকে তার ইসলামে আসার কথা বলবেন)।

পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় এটা ভালো মানসিক কৌশল। পুরোনো স্মৃতি নিয়ে আহাজারির মানসিকতা ছেড়ে নতুন জীবনের প্রতিশ্রুতির জন্য আগ্রহভরে অপেক্ষা করুন। আপনার নতুন অভ্যাস কীভাবে আপনার জীবনকে আরও সুন্দর করবে সেটা কল্পনা করুন। পুরোনো অভ্যাস ফেলে দিলে কী হারাবেন, এগুলো চিন্তা করে মাথা খারাপ করবেন না। পরিবর্তনের পর আপনার অবস্থা কল্পনা করুন যাতে পরিবর্তনের ব্যাপারে অধীর আগ্রহ বাড়ে। আর অতীতের সাথে জোড়া কমে।

আমি বলছি না যে এতে পরিবর্তনের পথ সহজ হবে। তবে এতে পরিবর্তনের কষ্ট অনেকটা কমবে।

কুরআনে পরিবর্তন

আমি এখন পরিবর্তনের ভাষার প্রকৃতি নিয়ে কথা বলব। কুরআনের প্রথম দিকের সূরাগুলো নাজিল হয়েছিল রাসূল ﷺ মক্কায় থাকা অবস্থাতে। মক্কাবাসীরা কুরআনের সেই ভাষাভঙ্গিমার প্রতি কীভাবে সাড়া দিয়েছিল?

কুরআনের প্রায় চারভাগের তিনভাগ সূরা মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। শুরু হয়েছে যখন ফেরেশতা জিবরাঈল রাসূল ﷺ-কে বলেছেন, 'পড়'!

মাক্কী সূরাগুলোতে মহান আল্লাহর একত্ব, শক্তিশালী নৈতিক মূল্যবোধের গুরুত্বের কথা বলেছে, মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ার করেছে, নবি-রাসূল ও বিশ্বাসীদের অনুপ্রেরণামূলক কাহিনি বলেছে, জান্নাতের তাক লাগানো বর্ণনা ও জাহান্নামের ভয়াবহতার কথা বলেছে।

মাক্কী সূরাগুলোর ছন্দ দ্রুত। ঠিক যেন ও সময়ে যারা বদলে গিয়েছিল তাদের মতো।

কুরআনের ১১৪টি সূরার ৮৬টি সূরা রাসূল ﷺ মক্কায় থাকা অবস্থায় নাযিল হয়েছে। ৪ হাজারেরও বেশি আয়াত আছে এই সূরাগুলোতে। শুরু হয়েছে 'পড়'! দিয়ে। শেষ হয়েছে ৮৩ নম্বর সূরা আল মুতাফফিফীন দিয়ে।

কুরআনের আয়াত সব মক্কাবাসীর মন জয় করেনি। তবে বেশ ভালো পরিমাণ মানুষের মনকে বদলে দিয়েছিল। এমন বড়সড় পরিবর্তনের পথে এমনটা হওয়াই স্বাভাবিক।

মক্কার সংখ্যাগরিষ্ঠরা এই পরিবর্তনকে কীভাবে দেখেছে?

মক্কার নেতাগোত্রীয় লোকেরা সমাজের তৎকালীন অবস্থায় ভালো উপকার পাচ্ছিল। যে কারণে স্বাভাবিকভাবে তারা এই পরিবর্তনের ঘোরবিরোধী ছিল। যেকোনো বড় পরিবর্তনে জয়ী, পরাজয়ী থাকে। মক্কার বেশিরভাগ আয় হতো মূর্তিপূজারী তীর্থযাত্রীদের মক্কা সফর থেকে। এই রীতি যদি তাওহিদবাদী ধর্ম বদলে দেয়, তাহলে তা শহরের আয় ও নিরাপত্তাকে ঝুঁকির মুখে ফেলবে। এর দিকে ইঙ্গিত করে মহান আল্লাহ বলেন,

> 'তারা বলে, আমরা যদি তোমার সাথে পথনির্দেশ অনুসরণ করি, তাহলে আমাদের ভূমি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে'। আল কাসাস : ৫৭

মক্কাবাসী যেভাবে পরিবর্তনে বাধা দিয়েছে

- কাবায় সালাত আদায়ের সময় মুসলিমদের হয়রানি করেছে। 'তোমরা কি তাকে দেখেছ যে, একজন দাসকে বাধা দেয় যখন সে সালাত পড়ে'? আল আ'লাক : ৯-১০
- রাসূল ﷺ ক্ষমতার পেছনে ছুটেছেন এমন গুজব ছড়িয়েছে।
- ইসলামের দিকে ফিরে আসাদের ওপর শারীরিকভাবে হামলা করেছে। কখনো কখনো মেরে পর্যন্ত ফেলেছে। যেমন- মক্কাবাসীরা বিলাল (রা)-কে নির্যাতন করেছে। সুমাইয়া (রা)-কে শহীদ করে ফেলেছে।

আগেই বলেছি, পরিবর্তনের জন্য পরিস্থিতি অনুযায়ী বদলানোর মানসিকতা ও ভবিষ্যত জীবনের প্রতি নজর দিতে হয়। আরও দরকার নতুন দক্ষতায় প্রশিক্ষণ যেটা পরিবর্তনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

আমরা এখন দেখব নতুন ফিরে আসা মুসলিমরা নতুন জীবনের প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য কী করেছিলেন।

প্রশিক্ষণের গুরুত্ব

তিন বছরব্যাপী ইসলাম গ্রহণকারী নব-মুসলিমরা আল আরকাম নামে এক সাহাবীর বাড়িতে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার জন্য যেকোনো প্রক্রিয়াতে প্রশিক্ষণ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ নতুন জীবন রীতিতে অভ্যস্ত হওয়ার ব্যাপারটা চর্চার সাথে আসে। লেকচার আর লেসনের মাধ্যমে না। আমি এখানে প্রশিক্ষণের গুরুত্বের কথা বলব আল আরকামের বাড়িতে কী হতো সেটা বলে।

আব্বাসিদ শাহজাদা যখন আল আরকামকে অনেক পরে মসজিদ বানান তখন থেকে এটি আল খুযায়রানের বাড়ি নামে পরিচিত হয়। বায়তুল্লাহর সীমানা বাড়ানোর কারণে এখন আর এটি নেই।

আল আরকামের বাড়িতে ৪০ জন পর্যন্ত মানুষ এক হতে পারত। তারা সেখানে রাসূল ﷺ-এর কাছ থেকে শিখতেন, ইবাদত করতেন, নতুন জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ নিতেন। নতুন কনভার্টদের মন জয় করবেন কীভাবে সেটাও শিখতেন।

প্রশিক্ষণ মানে যা শিখছি তা চর্চা করা। শেখা ও চর্চা দুটোই সমান গুরুত্বপূর্ণ। ২১ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ শুধু শেখা না, যা শিখছি তা চর্চা করাও। ইসলামে আসা সাহাবীগণ যদি আল আরকামের বাসায় প্রতিদিন দুঘণ্টা করে মোট তিন বছর প্রশিক্ষণ নেন, তাহলে মোট সময় দাঁড়ায় ২ হাজার ঘণ্টা।

শুধু শিখে আসল পরিবর্তন আসে না। আসে প্রশিক্ষণ ও চর্চার মাধ্যমে। কাজেই প্রশিক্ষণের গুরুত্বকে নিচু করে দেখবেন না। প্রশিক্ষণের মধ্যে আছে নিজের দক্ষতা বাড়ানোর জন্য প্রশিক্ষণ সেশনে উপস্থিত হওয়া।

কেউ কেউ প্রশিক্ষণকে পাত্তা দেন না। শুধু নিজেদের তথ্য বাড়ানোর দিকে নজর দেন। যে কারণে তাদের কাজের মধ্যে এসব তথ্যের কোনো ছাপ পাওয়া যায় না।

কেউ আবার প্রশিক্ষণ নিতে বিব্রতবোধ করেন। মনে করেন তিনি যেকোনো একটা দক্ষতা জানেন না, এটা জানলে অন্যরা না-জানি কী

মনে করবে। এই নিয়ে হীনমন্যতায় ভোগেন। তবে বীরত্ব তো সেখানেই, যখন নিজেকে আরও ভালো মানুষে পরিণত করার জন্য কেউ কঠিন অবস্থায় ঝাঁপিয়ে পড়েন।

স্মার্ট প্রশিক্ষক আপনাকে উৎসাহিত করবে, আপনাকে গড়ে উঠতে নাড়া দেবে। কিন্তু অন্যের সামনে আপনাকে বিব্রত করবে না।

নিরাপদ পরিবেশ

স্মার্ট প্রশিক্ষক প্রশিক্ষার্থীর জন্য নিরাপদ পরিবেশ দেয়। যেখানে সে একবার ভুল করলে বারবার শুধরানোর সুযোগ পায়। যেখানে পরিণামের ভয় না করে কোনো নির্দিষ্ট দক্ষতায় তার ঘাটতি নিঃসঙ্কোচে বলতে পারে।

আল আরকামের বাড়িতে প্রশিক্ষণ নিতে আসা সাহাবীগণ এমন পরিবেশই পেয়েছিলেন। রাসূল ﷺ সেখানে শান্ত ও সহমর্মী পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তাদের পথনির্দেশ দিয়েছেন। কাউকে ব্যক্তিগত আক্রমণ করেননি; বরং নজর দিয়েছেন তাদের আচরণের উন্নতির দিকে। যেমন- কীভাবে সঠিকভাবে সালাত পড়বে।

রাসূল ﷺ এমন এক পরিবেশ তৈরি করেছিলেন যেখানে প্রশিক্ষার্থীদের ভুলের ভয় করতে হতো না। হাসি-তামাশার পাত্র হতে হতো না। ফলে তারা গড়ে উঠতে পারতেন।

আল আরকামের এই নিরাপদ পরিবেশ যেকোনো ট্রেনিং কোর্সেই থাকা উচিত। আপনি এতদিন ধরে কতটা জানেন, তার চেয়ে এখানে থাকবে বারবার প্রচেষ্টার সুযোগ। নজর থাকবে আপনার শক্তিমত্তার দিকটা ব্যবহারের ওপর।

নিজের পরিস্থিতি বদলান

পরিবর্তন এবং পরিবর্তন প্রক্রিয়ায় প্রশিক্ষণের গুরুত্বের কথা বলতে যেয়ে আমরা নজর দিয়েছি ব্যক্তির ওপর। তবে কখনো কখনো ব্যক্তির নিজেকে তার পরিবেশ-পরিস্থিতি বদলাতে হতে পারে। মক্কা ছেড়ে রাসূল ﷺ যখন মদিনায় গেলেন কিংবা নতুন ইসলামে আসা কিছু সাহাবীগণ যখন ইথিয়োপিয়ায় চলে গেলেন তখন কিন্তু তারা তা-ই করেছিলেন।

কীভাবে নিজের পরিবেশ বদলাবেন এটা নিয়ে কথা বলার আগে এবং যারা নিজেদের পরিবেশ বদলে ইথিয়োপিয়াতে বসতি গড়েছিলেন তাদের অভিজ্ঞতা থেকে ফায়দা নেওয়ার আগে, তাদের অভিজ্ঞতার ব্যাপারে আপনাকে কিছু ধারণা দিই। নিজেকে বা যেখানে আছি সে জায়গা কেন বদলাতে হবে, সে ব্যাপারে এই ঘটনা আপনাকে সাহায্য করতে পারবে হয়ত।

ইথিয়োপিয়া

এক শ'রও বেশি মক্কাবাসী ইথিয়োপিয়াতে থাকতেন। তাদের ২১ জনের সেখানে স্থায়ী বসতি ছিল। বাকিরা মদিনায় স্থানান্তরিত হওয়ার আগ পর্যন্ত ওখানে ছিলেন।

আমরা নিশ্চিতভাবে জানি না কীভাবে তারা তাদের নতুন পরিবেশের সাথে মানিয়ে নিয়েছিলেন। কিন্তু আমরা জানি, তারা সবাই একসাথে ছিলেন। সেখানে জন্মানো ও বড় হওয়া শিশুদের মধ্যে মূল্যবোধ ধরে রাখতে বেশ সতর্ক ছিলেন তারা। ইউরোপে যে ৪৪ মিলিয়ন মুসলিম বসবাস করেন এবং কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকায় ৪ মিলিয়ন তাদের জন্য এটা ভালো অনুপ্রেরণা হতে পারে।

জাফর ইবন্ আবী তালিব (রা), ২৭ বছর বয়স্ক যুবক। ইথিয়োপিয়ান নেতা আন নাজ্জাশীকে ইসলামে নিয়ে আসতে পেরেছিলেন তার চমৎকার ক্ষুদেভাষণ আর মনমোহিনী কুরআন তেলাওয়াত দিয়ে। সূরা মারইয়াম পাঠ করেছিলেন তিনি।

ইথিয়োপিয়ায় হিজরতকারী মুসলিমদের থেকে আমরা কী উপকার পেতে পারি?

নতুন ইসলাম গ্রহণকারীরা তাদের পরিবেশের সর্বোচ্চ ব্যবহার করেছিলেন। আয যুবিন সাঁতার শিখেছিলেন। আম্নি নামে এক বালিকা স্থানীয় ভাষা রপ্ত করেছিল। আপনিও আপনার আশেপাশের সুযোগের সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহার করতে পারেন। কনভার্টরা এক জায়গায় থেকেছিল একত্রে থাকার জন্য। সংখ্যাগরিষ্ঠ হিসেবে তাদের পরিচয় অটুট রেখেছিল। আপনিও এমন লোকেদের সাথে থাকুন, যারা আপনাকে সহযোগিতা করবে। আপনি হয়ত কনভার্ট না। তবে হতে পারে নতুন করে ইসলামে ফিরে এসেছেন। আপনার জন্যও তাই একথাগুলো প্রযোজ্য।

দৃষ্টিভঙ্গি বদলান

আশপাশ বদলানো মানে শুধু নতুন দেশে যাওয়াই না। আপনার উন্নতির পথে যেসব দৃষ্টিভঙ্গি বাধা দিচ্ছে সেগুলোও। যখন আমরা বলি মেজাজ হারাবেন না, সিগারেট খাওয়া ছাড়ুন, শরীরের বাড়তি ওজনের দিকে নজর দিন, তখন আমরা বলি আপনার সেই দৃষ্টিভঙ্গি বদলান যেটা আপনার মেজাজ বিগড়ে দিচ্ছে, সিগারেট খেতে বলছে বা অতিরিক্ত খেতে বলছে। নিজের ঘরে থেকেই আপনি এটা করতে পারেন।

চল্লিশের কোঠায় রাসূল ﷺ মক্কাতে কাটিয়েছেন। ৫০-এর কোঠায় তিনি নিজেকে এমন এক পরিস্থিতিতে দেখতে পান, যেখানে তাকে মদিনায় যেতে বাধ্য হতে হয়। পরে সেখানেই বসতি গড়েন। এই অবস্থার কথা আমরা এমন এক দৃষ্টিকোণ থেকে বলব, যেটা আপনাকে আরও ভালো হতে অনুপ্রাণিত করবে।

রাসূল ﷺ-এর জীবনের মূল ঘটনা

চল্লিশের কোঠায় রাসূল ﷺ-এর জীবনের মূল ঘটনাগুলো আবার দিচ্ছি-

- ৪৩ তম বছর- আল-আরকামে প্রশিক্ষণ সমাপ্ত
- ৪৫ তম বছর- মুসলিমদের প্রথম দল ইথিয়োপিয়াতে যায়।
- ৪৬ তম বছর- মুসলিমদের দ্বিতীয় দল ইথিয়োপিয়াতে যায়।
- ৪৭-৫০ তম বছর- মূলধারার মাক্কী সমাজ থেকে রাসূল ﷺ ও তাঁর পরিবার ধীরে ধীরে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

দ্বন্দ্ব

একটা সময় রাসূল ﷺ ও পরিবর্তন বিরোধীদের মধ্যকার সম্পর্কের চূড়ান্ত অবনতি হয়। মক্কায় প্রায় ৪০ জন উচ্চবর্গের নেতাগোছের লোক ছিলেন। তারা সিদ্ধান্ত নিলেন রাসূল ﷺ ও হাশিমীদের (রাসূল ﷺ-এর পরিবার) সাথে সব ধরনের সম্পর্ক ছিন্ন করবেন। মানে তাদের সাথে কোনো আর্থিক লেনদেন হবে না। তাদের কাউকে বিয়ে করবে না।

আধুনিক পরিভাষায় একে বলা যায়, সামাজিকভাবে একঘরে করে রাখা। অর্থনৈতিক বয়কট। কারণ তখন মক্কার জীবন এমন ছিল না যে, কেউ

আলাদাভাবে থেকে জীবন চালাতে পারবে। ৩ বছরেরও বেশি সময় হাশিমীদেরকে চরম খাদ্যাভাবের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। তা আরও বাড়ত যদি না মক্কার এক নেতা হিশাম ইবনে আমরের খারাপ না-লাগত। খারাপ হতে থাকা মানবিক পরিস্থিতি দেখে এবং এই বয়কট শেষ করার জন্য তিনি কোনো পদক্ষেপ না-নিতেন, পরিস্থিতি আরও ভয়াবহতার দিকে যেত। আচ্ছা, হিশাম ইবনে আমর কীভাবে নিজে নিজে এই উদ্যোগ নিলেন? চলুন দেখি।

যোগাযোগের মাধ্যমে বদল

হিশাম নীরব থাকেননি। তিনি অন্য আরেক স্থানীয় নেতা যুহাইরের সাথে এ নিয়ে আলাপ করেন। তিনিও তাদের এই অবস্থা নিয়ে অস্বস্তিতে ছিলেন। তবে কিছু করার আগে তিনি আরও লোক খুঁজতে বলেন। হিশাম আল মিত'আমের কাছে যান। তিনিও অনুরূপ কথা বলেন এবং আরও লোক খুঁজতে বলেন। এবার হিশাম আবু আল বাহতারীর কাছে যান। তিনি তাকে পঞ্চমজন খুঁজতে বলেন। তো শেষমেষ তারা ছয়জনের গ্রুপে পরিণত হন যারা আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন এবং সফলভাবে বয়কট শেষ করেন।

খেয়াল করুন, হিশাম কিন্তু কাউকে তাদের মন বদলাতে রাজি করেননি। তারা আগে থেকেই বিষয়টা নিয়ে একমত ছিলেন। তিনি শুধু সংযোগকারী হিসেবে কাজ করেছেন। ঠিক আবু বকর (রা)-এর প্রথম দিকের মুসলিমদের সাথে যেভাবে কানেক্টর হিসেবে কাজ করেছিলেন, ঠিক সেভাবে।

পরিবর্তনের উপকরণ

যেসব আন্দোলন সফলভাবে পরিবর্তন নিয়ে আসে তার মধ্যে যা থাকে: অনুপ্রেরণামূলক চিন্তা, ক্যারিশমাটিক নেতৃত্ব, নিবেদিতপ্রাণ অনুসারী।

আজ কোটি কোটি ইন্টারনেট ব্যবহারকারী। বেশিরভাগই ফেসবুক আর টুইটারের মতো সামাজিক যোগাযোগ সাইটের মাধ্যমে সংযুক্ত। এরা একটি চিন্তার পেছনে এক হতে পারে এবং পরিবর্তন দ্বারা অনুপ্রাণিত হতে পারে।

কীভাবে সাধারণত পরিবর্তন ঘটে সে ব্যাপারে সেথ গোডিন তার সাড়া জাগানো বই 'ট্রাইবস'-এ বলেছেন-

> '[পরিবর্তনের জন্য] আন্দোলন ঘটে যখন লোকেরা একে অপরের সাথে কথা বলে, যখন চিন্তা গোটা সমাজে ছড়িয়ে পড়ে এবং সবশেষে একে অপরের সমর্থন পেয়ে তারা সেই কাজটার দিকে এগিয়ে যায়, যেটা তারা সবসময় জেনে এসেছিল সঠিক কাজ'।[৫]

হিজরত

বয়কট শেষ হলেও রাসূল ﷺ-এর অবস্থা খুব একটা উন্নত হয়নি; বরং আরও অবনতি হয়েছিল। কারণ কয়েকদিনের ব্যবধানে তাঁর চাচা আবু তালিব ও স্ত্রী খাদিজা মারা যান।

তাঁর রাজনৈতিক আশ্রয়দাতার মৃত্যুতে বিরোধীরা নতুন সমারোহে নাজেহাল অভিযান শুরু করে। 'চাচা মারা যাওয়ার আগে কুরাইশরা আমার সাথে ঘৃণ্য কিছু করতে পারত না'। রাসূল ﷺ স্মৃতিচারণ করে বলেছেন।

৫৩ বছর বয়সে রাসূল ﷺ মক্কা ছেড়ে চলে যান। শেষ দশ বছর মদিনাতে কাটান। পরের অধ্যায় ও শেষ অধ্যায়ে আমরা মদিনা জীবন নিয়ে কথা বলব এবং আরও বলব আরব উপদ্বীপে পরিবর্তনের জন্য তিনি যে আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সেটা নিয়ে।

আমরা এই অধ্যায়ের শেষে চলে এসেছি। আমার লক্ষ্য ছিল পরিবর্তন সৃষ্টির জন্য আপনাকে উদ্দীপ্ত করা, রাসূল ﷺ এবং তাঁর কিছু বন্ধুদের অনুপ্রেরণামূলক উদাহরণ দেওয়া।

আমরা তাঁর জীবনের বাঁকবদল করা মুহূর্ত দেখেছি। এর শুরু হেরা পর্বতগুহায় অহী অবতীর্ণ দিয়ে আর শেষ মদিনায় হিজরত করে। বলেছি নিজের উন্নতি ও ভালো কোনো পরিবর্তনের পথে কীভাবে আপনি এই বাঁকবদল মুহূর্ত থেকে উপকৃত হতে পারেন।

পরিবর্তনে পেছনে কী কী কাজ করে তাও দেখেছি। আবেগি ও যৌক্তিক ব্যাপারস্যাপার; পরিবর্তনের সাথে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা, নতুন জীবনের আকাঙ্ক্ষা, কীভাবে নিজেকে বিকশিত করা যায় তা নিয়ে চিন্তা এবং সফলভাবে পরিবর্তন আনতে দক্ষতা অর্জনে প্রশিক্ষণের গুরুত্ব নিশ্চয় উপলব্ধি করতে পারছেন।

আমাদের একবিংশ শতাব্দী ক্রমাগত বদলে যাচ্ছে। পরিবর্তন এখন একটা বাজওয়ার্ড। মানে চারিদিকে একই কথা। 'পরিবর্তন চাই। বদল চাই'। এজন্য সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে এবং পরিবর্তনের সাথে মানিয়ে নেওয়ার জন্য প্রয়োজন নিজেকে দ্রুত বদলানোর ক্ষমতা।

নবিজির চল্লিশের কোঠার জীবন থেকে আমরা কী শিখতে পারি?

(নোট : এখানে ৪০ মানে আক্ষরিক অর্থে চল্লিশ না। আমি আসলে জীবনের একটা পর্যায় বুঝাচ্ছি। যে বয়সটাতে মানুষ পরিণত মনের অধিকারী হয়। সেক্ষেত্রে ব্যক্তিভেদে এটা একেক বয়স হতে পারে)

রাসূল ﷺ তাঁর চল্লিশে	পরিণত বয়সে আপনি
জিবরাঈল ফেরেশতা যখন তাঁকে চেপে ধরেছিল তখন তিনি প্রচণ্ড যন্ত্রণা পেয়েছিলেন, কিন্তু তবু তিনি বার বার তাঁকে দেখতে চেয়েছেন। লম্বা সময় ধরে তার দেখা না-পেলে তাঁর মন খারাপ হতো।	পরিবর্তনের জ্বালা সহ্য করুন। কারণ এটা আগুনের পরীক্ষা যা আপনাকে উচ্চতর পর্যায়ে নিয়ে যাবে।
রাসূল ﷺ নিজেকে ও তাঁর বন্ধুদের আল আরকামের বাড়িতে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য।	একবিংশ শতাব্দীতে টিকে থাকতে হলে আপনাকে শিখতে হবে। তবে প্রতিষ্ঠালাভ করতে হলে শিখতে হবে, প্রশিক্ষণ নিতে হবে, চর্চা করতে হবে।
রাসূল ﷺ মক্কা ছেড়ে মদিনায় বসতি গড়ে তাঁর পরিবেশ বদলে ফেলেছিলেন।	আপনার পরিবেশ যদি আপনাকে টেনে ধরে রাখে, তাহলে পরিবেশ বদলান। সেটা হতে পারে জায়গা অথবা অবস্থা।

পঞ্চাশের কোঠায় রাসূল ﷺ

সফল পরিবর্তনের জন্য দরকার সফল নেতৃত্ব। সফল নেতৃত্ব মানে লোকেরা আগে যা চায়নি, তা চাওয়ার স্পৃহা জাগিয়ে তোলা এবং পাওয়ার ব্যবস্থা করা। নেতৃত্ব মানে লোকেরা যখন মনে করেছে কিছু পারবে না, তখন তাদের দিয়ে তা করানো। একজন নেতা ঝুঁকি নেন, সুযোগ খোঁজেন। তিনি এমন কিছু দেন যাতে মানুষ বিশ্বাস করে, অর্জনের জন্য মানুষকে অনুপ্রাণিত করেন। রাসূল ﷺ যখন মদিনায় আসেন, তখন শহর জিনিসটার নতুন সংজ্ঞা দেন। নতুন সম্পর্ক গড়েন, বিশ্বাসের জন্য মানুষকে নতুন দর্শন দেন। নেতা হওয়া যদিও সহজাত গুণ, তবে এটা শেখাও যায়। প্রয়োগ করা যায়। এমনকি অপেক্ষাকৃত হালকা পর্যায়ের দায়িত্বের বেলাতেও।

নেতৃত্ব গুণ

৫৩ বছর বয়সে রাসূল ﷺ মক্কায় পাড়ি জমান। শহরের প্রধান হিসেবে সেখানে তিনি জীবনের বাকি ১০ বছর কাটান। চল্লিশ যদি হয় পরিবর্তনের সময়, তাহলে পঞ্চাশ হলো নেতৃত্বগুণ প্রয়োগের সময়।

কেউ কেউ মনে করেন শুধু রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই বুঝি নেতা শব্দটা খাটে। কিন্তু যেকোনো পর্যায়ে দায়িত্ব নিলেই কিন্তু কেউ নেতা হয়ে উঠতে পারে। হতে পারে সেই দায়িত্ব আপনার পরিবারের, আপনার শিক্ষার্থীর, আপনার কর্মচারীদের অথবা সেটা হতে পারে যে কারও উন্নতির জন্য তার দায়িত্ব নেওয়া।

নেতৃত্বের কিছু কিছু গুণ মানুষ জন্ম থেকেই পায়। তবে অন্য যেকোনো দক্ষতার মতো প্রশিক্ষণ ও চর্চার মাধ্যমে এটাও যে-কেউ অর্জন করে নিতে পারে। এজন্য কোনো নির্দিষ্ট বয়সে পৌছার দরকার পড়ে না। নেতৃত্বের ভার হাতে নেওয়ার জন্য আপনি কতটা তৈরি এবং আপনার মধ্যে দায়িত্ববোধ কতটা, এটা তার ওপর নির্ভর করে।

এই অধ্যায়ে আমরা দেখব যুদ্ধ ও শান্তির সময়ে রাসূল ﷺ নেতা হিসেবে কেমন ছিলেন। কীভাবে তিনি কোনো লোকের ব্যক্তিত্ব ও সংস্কৃতি অনুযায়ী তার সাথে আচরণ করেছেন। এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্য শুধু মদিনার ঘটনাগুলোর বর্ণনা না। চিরায়ত জীবনীগ্রন্থগুলোতে এগুলোর বিস্তারিত খুঁজে পাওয়া যাবে। এখানে আমি দেখাব কীভাবে রাসূল ﷺ-এর মদিনা জীবন থেকে আপনি নেতা হওয়ার জন্য অনুপ্রাণিত হতে পারেন। সেই নেতৃত্ব হতে পারে পরিবারের, কর্মক্ষেত্র বা যেকোনো দায়িত্বে; এমনকি নিজের ওপরও।

মদিনা

প্রথমে আমরা মদিনা নগর এবং মদিনার অধিবাসী সম্পর্কে কিছু জানব। কীভাবে উভয়ের উন্নয়ন ধারাকে রাসূল ﷺ নেতৃত্ব দিয়েছেন। বর্তমান সাউদি আরাবিয়ার উত্তর দিকে মদিনার অবস্থান। দুপাশে দুই পাহাড়, উত্তরে উহুদ, দক্ষিণে আইর। মদিনা আরবের মরুদ্যান। এর মাটি উর্বর। ভূতলে প্রচুর পানি। নিচু নিচু উপত্যকা দিয়ে বৃষ্টির ধারা বয়ে চলে মৌসুমী নদীর মতো।

মদিনার নাম আগে ছিল ইয়াসরিব। মক্কা থেকে এটা প্রায় ৪০০ কিলোমিটার দূরে। ইসলাম আসার আগে মক্কার যেমন একটা ধর্মীয় মর্যাদা ছিল, মদিনার তেমন কিছু ছিল না। গোত্র-লড়াই ছিল স্বাভাবিক। বাণিজ্যিক কোনো কেন্দ্রও ছিল না। কারণ কোনো কাফেলা রুটের মাঝখানে এটা ছিল না।

এর তেমন কোনো রাজনৈতিক ক্ষমতাও ছিল না। কেন্দ্রীয় কোনো হাজতখানা বা পুলিশ বাহিনী ছিল না। যদিও এর আয়তন মক্কার চেয়ে অনেক বেশি ছিল। মদিনার প্রত্যেক প্রতিবেশী গোষ্ঠীর নিজস্ব আশ্রয়স্থল বা দুর্গের মতো ছিল। এটা তাদের পাশের প্রতিবেশি থেকে তাদের রক্ষা করত। এরকম দুর্গের সংখ্যা ছিল প্রায় ৭৮টি। প্রশ্ন হলো, রাসূল ﷺ কীভাবে এমন এক অস্থিতিশীল অনিরাপদ শহর সামলালেন?

এক শব্দে বলতে গেলে, তিনি পরিবর্তনের একটা ধারা শুরু করেছিলেন। কোথাও কোনো পরিবর্তন আনার আগে যেকোনো বিচক্ষণ নেতাই সতর্কতার সাথে পরিস্থিতি নির্ণয় করেন। রাসূল ﷺও তা-ই করেছিলেন।

আমরা দেখব, ধর্ম বা ব্যক্তিগত বিশ্বাস যা-ই হোক, কীভাবে তিনি মানুষের মধ্যে সম্পর্কের উন্নতি ঘটিয়েছিলেন। আস্থা ও নিরাপত্তা অর্জনে সবার মধ্যে দায়িত্ব বন্টন করে দিয়েছিলেন। আমরা তাঁর নেতৃত্বের চ্যালেঞ্জগুলোও দেখব। যারা তাঁর নেতৃত্বে বাগড়া দিয়েছিল, তাদের সাথে তিনি কীভাবে আচরণ করেছিলেন তাও দেখব। মক্কাবাসিদের সাথে বড় তিনটি লড়াইয়ে (বদর, উহুদ, খন্দক) রাসূল ﷺ-এর অ্যাকশন থেকে বিভিন্ন উপকার নেব। দেখব কীভাবে রাসূল ﷺ তাঁর প্রভাব বাড়িয়েছেন এবং অবশেষে মক্কা জয় করেছেন মৃত্যুর মাত্র এক বছর আগে।[১]

যোগ্য নেতৃত্ব

৬২২ সালের জুনে ইয়াসরিবে পৌঁছে মানুষের মাঝে রাসূল ﷺ নতুন বাস্তবতা তৈরি করেন। দ্রুত তিনি উন্নয়নমূলক কাজ হাতে নেন। স্থানীয় অধিবাসীদের ধর্ম বিশ্বাস যা-ই হোক, তিনি সবার যাতে কল্যাণ হবে সে অনুযায়ী বিভিন্ন পদক্ষেপ নেন। যেমন ইয়াসরিবকে তিনি পবিত্র শহর হিসেবে ঘোষণা করেন। এখানে মক্কার মতো হানাহানি নিষিদ্ধ করেন। সামগ্রিক নিরাপত্তার জন্য গোটা শহরের অধিবাসীদের দায়িত্ব দেন।

হাদীস অনুযায়ী রাসূল ﷺ বলেন,

> 'ইবরাহীম নবি (আ) যেভাবে মক্কাকে হারাম করেছেন, আমিও সেভাবে মদিনাকে হারাম করেছি'।

মদিনার জনগণ রাসূল ﷺ-এর নেতৃত্ব নিয়ে বেশ সন্তুষ্ট ছিলেন। মজার ব্যাপার হলো, এদের বেশিরভাগই ছিলেন অমুসলিম। আর তারা তাঁকে নবি বলে মানতেনও না। এই যে এত বিশাল সংখ্যক জনগণ তাঁকে নেতা হিসেবে মেনে নিয়েছিলেন, এটা কিন্তু খাটো করে দেখার উপায় নেই। কারণ, এ রকমটা কখনো মদিনায় আগে দেখা যায়নি। যে জায়গা গোষ্ঠীলড়াইয়ে বিভক্ত ছিল, সেখানে বাইরে থেকে আগত কারও নেতৃত্ব মানা তো দূরের কথা, স্থানীয় কোনো একক নেতার অধীনে যে এক হবে, এমনটা ভাবাই যেত না।

প্রত্যেক গোত্র নিজেদের পাড়ায় থাকত। প্রত্যেক পাড়া মাঝখানে খামার, খালি জায়গা বা দুর্গ দিয়ে আলাদা থাকত। প্রত্যেক পাড়ার দায়িত্বে থাকতেন একজন শেখ। বিভক্ত আর অস্ত্রসস্ত্রের মজুদ থাকার কারণে প্রত্যেক পাড়া হুমকির মুখে থাকত। পরিস্থিতি এত নাজুক হয়ে পড়েছিল যে, তারা নিজেরাও আমূল সংশোধন গ্রহণের জন্য উন্মুখ হয়ে ছিল।

বাস্তব নেতৃত্বের ভিত্তি

মক্কায় আসার আগেই রাসূল ﷺ-এর সুনাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। যে কারণে মদিনার লোকেরা সাগ্রহে তাঁর নেতৃত্ব বরণ করে নিয়েছিল। তারা তাঁর যোগ্যতার প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই তা করেছিল। ভয় কিংবা জোরজবরদস্তিতে না।

রাসূল ﷺ-এর নেতৃত্বের এই দিকটা আপনাকে অনুপ্রাণিত করুক। আপনার যোগ্যতার ওপর অন্যদের আস্থা আর শ্রদ্ধাই যেন হয় আপনার নেতৃত্বের ভিত্তি। কঠিন সময়ে তাদের সহযোগিতা পেতে এটাই কাজে দেবে।

মদিনার কেন্দ্রে তিনি ২০০ স্কয়ার ফিটের মসজিদ বানান। সাথে তাঁর থাকার জায়াগাও। খাদিজার মৃত্যুর পর তিনি আবার বিয়ে করেছিলেন। মদিনায় তাঁর সাথে যেসব মুসলিম হিজরত করেছিলেন তাদের সাথে নিয়ে তিনি মসজিদ বানান। নিজ হাতেও কাজ করেছেন। তার সাথে যারা মসজিদ বানানোতে হাত লাগিয়েছিলেন, তাদের বেশিরভাগই ছিলেন ব্যবসায়ী। যারা কিনা অন্যান্য দাস বা কর্মচারীদের কাজের ভার দিতেন। রাসূল ﷺ নিজ হাতে মসজিদের নির্মাণ কাজে অংশ নিচ্ছেন এটা দেখে হাতপা গুটিয়ে বসে থাকা মদিনায় হিজরতকারী মুসলিমগণের পক্ষে সম্ভব ছিল না। 'যেখানে রাসূল ﷺ কাজ করছেন সেখানে আমরা বসে থাকি কীভাবে'- এমনটাই ছিল তাদের মনের অবস্থা।

জামায়াতবদ্ধ হয়ে সালাত পড়ার জন্য মুসলিমগণ এ মসজিদে জড়ো হতেন। মদিনায় আসার প্রায় ছয় মাস পর আযান চালু হয়। প্রথমদিকে জেরুজালেমের দিকে ফিরে মুসলিমগণ সালাত আদায় করতেন। মদিনার ইহুদি গোষ্ঠী চুক্তি ভাঙার পর এবং তাঁকে নবি ﷺ হিসেবে না-মেনে আগেকার ধর্মগ্রন্থের ওপর পড়ে থাকায় মহান আল্লাহর নির্দেশে কিবলা বা সালাতের অভিমুখ মক্কার দিকে ফেরানো হয়। মদিনার দ্বিতীয় বছরে মুসলিমগণ রমযান মাসে সিয়াম পালন করতে শুরু করেন।

নেতৃত্ব মানে শুধু ক্ষমতা না; বরং অন্যের অনুসরণের জন্য নজির তৈরি করে দেওয়া। দ্যা লিডারশিপ অফ মুহাম্মাদ বইতে জন আদাইর বলেছেন,

> 'শ্রম, বিপদ ও কঠিনতায় লোকদের সাথে ভাগাভাগি করার মাধ্যমে মুহাম্মাদ ভালো নেতৃত্বের এক সার্বজনীন মূলনীতি দেখিয়েছেন। মানুষ মনে মনে আসলে তাদের নেতাদের কাছ থেকে এটাই চায়। যখন তা হয় না, তখন বিরূপ মন্তব্য আসে'।[২]

মদিনাবাসী

সে সময়ে মদিনার মোট জনসংখ্যা কত ছিল তা জানা যায় না। তারা গুচ্ছ গুচ্ছ গোষ্ঠীদলের মতো বাস করত। প্রত্যেক ক্ল্যান বা গোত্র নিজেদের অধীন অঞ্চলে থাকত। আরবের অন্যান্য গোষ্ঠীর বাইরে মদিনাবাসীদের দুটো ভিন্ন বৈশিষ্ট্য ছিল-

- **ইহুদি:** প্রায় বিশের অধিক ইহুদি গোত্র ছিল। এদের কারও কারও আদি উৎস ছিল লেভান্ত। এদের অনেকেই ছিল দক্ষ কামার, ট্যানার অথবা কৃষক।
- **মুসলিম হিজরতকারী:** এরা মক্কা অথবা ইথিয়োপিয়া থেকে এসেছিল। নিজেদের থাকার জায়গা হওয়ার আগে কেউ মসজিদে থাকতেন। কেউ মদিনার মুসলিম কনভার্টদের বাড়িতে। প্রথম দফায় প্রায় ৬০ জন মুসলিম এসেছিলেন। পরে মক্কা ও তার আশেপাশের জায়গা থেকে হিজরতকারীর সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পায়।

সম্পর্ক বদল

রাসূল ﷺ একজনের সাথে আরেকজনের সম্পর্ক বদলে দিয়েছেন। শত্রু মনোভাব আর সন্দেহের বদলে নাগরিকত্ব ও আস্থার ওপর সম্পর্ক গড়ার পথ তৈরি করে দিয়েছেন।

তিনি এটা করেছিলেন মদিনা সংবিধানের মাধ্যমে। এটা তৎকালীন ভাষায় লেখা। অনেক নেটিভ আরবের কাছেও এর কিছু কিছু অংশ বুঝা কঠিন। এর ৫২টি ধারার শব্দ কিছুটা অপ্রচলিত হলেও সামাজিক চুক্তি লিখে রাখার ঘটনা

সেই সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে ছিল বৈপ্লবিক। আজও অর্থবহ। রাসূল ﷺ সেখানে মদিনার সবাইকে 'এক জাতি' বলেছেন। মদিনাকে পবিত্র শহর ঘোষণা করেছেন। মক্কার মতো সব ধরনের হানাহানি এখানে নিষিদ্ধ করেছেন। স্থানীয় জনগণকে নিরাপত্তার জন্য দায়ভার বেটে দিয়েছেন। সবার জন্য যার যার ধর্ম বিশ্বাস চর্চার স্বাধীনতা নিশ্চিত করেছেন।

'Leadership & The New Science' বইতে মার্গারেট হুইটলি বলেছেন,

> চিরাচরিত নেতারা নজর দেন ভূমিকা আর দায়িত্বের ওপর। নতুন নেতারা মানবিক সম্পর্ক গড়ে তোলেন, যেটা হয়ে উঠে সাফল্যের আসল শক্তি।[৩]

মদিনা সংবিধান শুধু এর ধারার শব্দগুলোর জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল না; বরং সমাজের সবার মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের জন্যও।

শুধু বিধিবিধান কোনো সফল রাষ্ট্র, কোম্পানি বা পরিবার গড়ে দেয় না। প্রত্যেক অধিবাসী যখন বুঝে, সে নিজের গোষ্ঠীর চেয়ে বড় কোনো অস্তিত্বের অংশ তখন সে সানন্দে সব করে। রাসূল ﷺ এটা বুঝেছিলেন। পূরণ করেছিলেন। যে কারণে মদিনার সংখ্যাগরিষ্ঠ অমুসলিমরাও তাঁর নিয়ম মেনে নিয়েছিল।

পরিবর্তনের পথে

রাসূল ﷺ মদিনায় বড় ধরনের পরিবর্তন আনেন। কেন্দ্রীয় শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। নিরাপত্তা জোরদার করেন। হিজরতকারী মুসলিমগণের জন্য ম্যালেরিয়া রোগের উর্বর এক জলাভূমি পরিষ্কার করে বাড়িঘর বানিয়ে দেন। এরা হয় মসজিদে ঘুমাতেন, নয় অন্যান্য পরিবারের সাথে অস্থায়ীভাবে থাকতেন।

বদর যুদ্ধের পর কাফেরদের সাথে লড়াইয়ে ঘোড়ার প্রয়োজনীয়তা টের পাওয়া যায়। রাসূল ﷺ ঘোড় দৌড়ের জন্য আলাদা জমির ব্যবস্থা করেন। লোকদেরকে ঘোড়া কিনতে উৎসাহিত করেন।

তিনি শিক্ষাদীক্ষাকে উৎসাহিত করেন। নিরক্ষরতা দূর করার জন্য যুদ্ধবন্দীদের মুক্তি দেন। তারা মদিনার শিশুদের লিখতে পড়তে শেখাতেন।

কীভাবে পরিবর্তনে সামনে থেকে নেতৃত্ব দেবেন?

- প্রথমে পরিবর্তনের চাহিদা তৈরি করুন। আপনার লোকজনদের সাধারণত ৭৫ ভাগকে পরিবর্তনের গুরুত্বের ব্যাপারে আশ্বস্ত হতে হবে।

মদিনার জনগোষ্ঠীর নিজেদের মধ্যে লাগাতার মারামারির কারণে শান্তিতে জীবনযাপনের প্রয়োজনীয়তা চেপে ধরেছিল। তাই তারা রাসূল ﷺ-এর সংস্কার নিয়ে খুশি ছিল, কারণ তারা নিরাপদের জীবনযাপনের জন্য তৃষ্ণার্ত পথিকের মতো হা করে ছিল।

- পরিবর্তন নিয়ে আপনার রূপরেখা পরিষ্কারভাবে বলুন। কোনো অসঙ্গতি যেন না-থাকে। তাহলে লোকজন বুঝবে আপনি আসলে কী চান। তারা নিজের চোখে সব দেখতে পারবে।

নিরাপদ ও ভবিষ্যৎ মদিনার ব্যাপারে রাসূল ﷺ তাঁর কথা স্পষ্ট করে বলেছেন, 'মদিনাকে আমি হারাম করলাম যেভাবে নবি ইবরাহীম (আ) মক্কাকে হারাম করেছিলেন'। একথা শোনামাত্র সবাই নিজেদের শহরকে মক্কার মতো নিরাপদ কল্পনা করতে পেরেছিলেন।

- পরিবর্তনের ব্যাপরে যারা আশ্বস্ত তাদের নিয়ে কাজ করুন। এদের মধ্যে থাকতে পারেন উচ্চপদস্থ অফিসিয়াল ও অন্যান্য প্রভাবশালী লোক।

বদর যুদ্ধে কুরাইশদের চ্যালেঞ্জ করতে যারা তার পরিকল্পনাকে মজবুত করবে রাসূল ﷺ তাদের সমর্থন খুঁজেছেন। সা'দ ইব্ন্ মু'আযের মতো গুরুত্বপূর্ণ গোষ্ঠী প্রধানদের কাছে পেয়েছিলেন।

নেতৃত্বের চ্যালেঞ্জ

একজন নেতাকে সবসময় বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখী হতে হয়। যেমন- কঠিন সময়, ঝামেলা পাকানো লোকজন অথবা যারা পরিবর্তনের ঘোরবিরোধী এমন লোকজন।

মদিনায় রাসূল ﷺ দুধরনের লোকদের থেকে বেশি সমস্যার মুখোমুখী হয়েছেন। এদের একদল আমার ভাষায় বাগড়া-বাধানো ধরনের লোক। যারা তাদের স্বার্থে ঝুঁকি খুঁজে পেয়েছিল। দ্বিতীয় দল শক্তভাবে ভিন্নমতাবলম্বী, যারা কায়নুকার ইহুদি গোত্রের সাথে মিলিত হয়েছিল। এখন আমরা দেখব, দুটো দলের সাথে রাসূল ﷺ কীভাবে তাঁর নেতৃত্বের চ্যালেঞ্জ সামলেছিলেন। আমি চাই,এখান থেকে আপনিও

আপনার বিরোধীদের সাথে মোকাবিলায় শক্তি পান। চলুন বিরোধীদের মোকাবিলার পরিকল্পনার রসদ খুঁজি।

বাগাড়া-বাধানো দল

কেউ কেউ রাসূল ﷺ যেসব পরিবর্তন আনতে চাচ্ছিলেন তাতে বাধা দিয়েছিল। তিনি তাদের স্বার্থের জন্য হুমকি ছিলেন। আবার যে অবস্থায় তারা অভ্যস্ত ছিল তার প্রতিও রাসূল ﷺ-এর পরিবর্তন চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াচ্ছিল। তারা রাসূল ﷺ-এর নেতৃত্বের বিরুদ্ধে ঝামেলা পাকানো, অস্থিরতা তৈরি এবং কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব নড়বড়ে করে দেওয়ার হীন উদ্দেশ্যে 'আদ দিরার' নামে ভিন্ন একটি মসজিদ বানায়। তাদের কোনো নির্দিষ্ট গোত্র বা রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বিশ্বাস ছিল না। এটা ছিল পরিবর্তনের ঘোরবিরোধী লোকদের জোট। আল্লাহ তায়ালা এদেরকে 'মুনাফিক' বলেছেন।

তারা সংখ্যায় মোট কত ছিলেন আমরা জানি না। কিংবা তারা কোনো জনগোষ্ঠীর অংশ ছিলেন কিনা তাও জানা যায় না। তাদের সবচেয়ে বিখ্যাত নেতা ছিলেন আবদুল্লাহ ইবন্ উবাই। বদর যুদ্ধে মুসলিমগণের জয়ের পর তিনি অনিচ্ছাবশে ইসলাম গ্রহণ করেন। এদের মোকাবিলার জন্য রাসূল ﷺ তাদের ব্যক্তিত্ব এবং সমস্যার ধরন অনুযায়ী বিভিন্ন কৌশল খাটিয়েছিলেন। কখনো তাদের সাথে সংলাপে বসতেন। কখনো কাউকে উপেক্ষা করতেন। আবার কখনো কখনো কাউকে কাউকে মদিনা থেকে বের করে দিতেন।

ভিন্নমতাবলম্বী লোকজন

অন্যরা মদিনা সংবিধানের বিরোধিতা করেছিল। মদিনার নিরাপত্তার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। যেমন কায়নুকা গোত্র। এরা তুলনামূলক ধনী গোষ্ঠী। মদিনার স্বর্ণবাজারে এদের আধিপত্য ছিল। বদর প্রান্তর থেকে বিজয়ী হয়ে ফেরার পর রাসূল ﷺ কায়নুকা গোষ্ঠীকে মদিনা সংবিধান লঙ্ঘনের ব্যাপারে হুঁশিয়ার করে দেন। এতে করে তাদের এক নেতৃত্বস্থানীয় লোক স্পর্ধার সাথে বলেছিল,

> 'তোমরা এমন একদল (মক্কার কুরাইশরা) লোকের সাথে লড়েছ, যারা জানে না কীভাবে লড়াই করতে হয়। আমাদের সাথে এসো, তাহলে বুঝবে লড়াই কী জিনিস'।

সুদ নিষিদ্ধ করায় ওদের মেজাজ এমনিতেই চড়ে গিয়েছিল। আজকালকার দিনের বন্ধকি ব্যবস্থার মতো মরিয়া ধার-গ্রহিতাদের চড়া সুদে ঋণ দিয়ে

এসব স্বর্ণব্যবসায়ীরা লাভ করত। মুসলিমগণ সুদমুক্ত বাজার তৈরি করায় তাদের এই লাভের গুরে পিঁপড়া বাসা বাধে।

পরিস্থিতি আরও ঘোলাটে হয় যখন কায়নুকা গোষ্ঠীর কিছু লোক একজন মুসলিম নারীর শ্লীলতাহানি করে এবং এর কিছুদিন বাদে এক মুসলিম পুরুষকে মারতে মারতে মেরে ফেলে। তারা তার রক্তপণ দিতেও অস্বীকার করে। স্থানীয় নিরাপত্তার জন্য বিষফোঁড়া হিসেবে না-রেখে রাসূল ﷺ তাঁর বাহিনী জড়ো করে এই গোষ্ঠীকে মদিনা ছাড়া করেন।

দ্বন্দ্ব নিরসন

নেতৃত্ব ও ব্যবস্থাপনার মাঝে পার্থক্য আছে। নেতৃত্ব মানে নির্দিষ্ট ভিশন। ব্যবস্থাপনা মানে সেই ভিশন অর্জনের তত্ত্বাবধান। রাসূল ﷺ-এর মধ্যে এই দুটো গুণই ছিল। তিনি প্রথমে একটি ভিশন দিয়েছেন, পরে সেটি বাস্তবায়নে কাজ করেছেন। অন্যান্যদেরকেও এগুলো শিখিয়েছেন। যেমন- কাউকে সামরিক বাহিনীর দায়িত্ব দিয়েছেন, কাউকে নিজের অবর্তমানে মদিনার দায়িত্ব দিয়েছেন।

বদর, উহুদ, খন্দকের যুদ্ধে রাসূল ﷺ-এর নেতৃত্বের ধরন এবং তিনি কীভাবে বিভিন্ন দ্বন্দ্ব নিরসন করেছেন এখন আমরা তা দেখব। আমাদের লক্ষ্য এসব যুদ্ধের গভীরে যাওয়া না; বরং কঠিন অবস্থায় রাসূল ﷺ-এর চিন্তা ও চর্চা কী ছিল সেটা দেখা উদ্দেশ্য।
তাহলে বদর দিয়ে শুরু করি।

বদরের যুদ্ধ

'যুদ্ধ সবসময়ই ভীষণ ক্ষতিকর। তবে কখনো কখনো এটা দরকার মূল্যবোধ বজায় রাখার জন্য, যেমন ইবাদাতের স্বাধীনতা'।[৪]

সাউদি আরাবিয়ার লোহিত সাগরের উপকূল রেখা ধরে হিজায অঞ্চলে রাসূল ﷺ তাঁর প্রভাব বাড়ান। অন্যান্য বেশকিছু গোষ্ঠীর সাথে মৈত্রী চুক্তি সাক্ষর করেন। বিশেষ করে যারা ছিল মদিনার প্রান্ত ও উপকূল অঞ্চলে। এর লক্ষ্য পরিষ্কার: মক্কার কাফেলা যেসব জায়গা দিয়ে অতিক্রম করে সেসব জায়গার গোষ্ঠীগুলোর প্রভাব বন্ধ করা। নিশ্চিত করা এসব গোষ্ঠীগুলো যাতে যুদ্ধে না-জড়ায়। রাসূল ﷺ কুরাইশদের গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য পথে বাধা তৈরি করতে পেরেছিলেন। ফলে তারা ব্যয়বহুল পথ বেছে নিতে বাধ্য হয়েছিল।

এমন এক ঘটনায় রাসূল ﷺ বিশাল এক কুরাইশ কাফেলার গতি রোধ করতে সক্ষম হন। এখানে ২ হাজার উট ছিল। সিরিয়া থেকে আমদানীকৃত প্রায় ৫০ হাজার দিনারের মূল্যমানের মালামাল ছিল। যখন তারা জানতে পারল যে, রাসূল ﷺ-এর লোকেরা এগিয়ে আসছে, তখন তারা তাদের পথ বদলাতে বাধ্য হয়।

মক্কায় এ নিয়ে হৈচৈ পড়ে যায়। মদিনার লোকদের উপযুক্ত জবাব দেওয়ার জন্য মক্কার একাংশ সশস্ত্র বাহিনী পাঠানোর যুক্তি তুলে ধরলে তা সফল হয়। এক হাজার সৈন্য ও সাতশ উটের বিশাল বহর নিয়ে তারা যাত্রা শুরু করে। রাসূলে ﷺ ভাবেননি যে, বিষয়টা এদিকে গড়াবে। অপ্রস্তুত অবস্থায় তিনি তিনশ যোদ্ধা ও সত্তর উটের বাহিনী জড়ো করতে সক্ষম হন।

যোদ্ধা ও সরঞ্জাম সেই সময়ের যুদ্ধে খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। মুসলিমদের ছিল মাত্র দুটো ঘোড়া। উটের চেয়ে তড়িৎ আক্রমণে ঘোড়া বেশি কার্যকর। কুরাইশদের ছিল একশ ঘোড়া। সোজা কথায়, মক্কাবাসিদের চেয়ে মুসলিমগণের অস্ত্রশস্ত্র মারাত্মক কম ছিল। রাসূলে ﷺ কীভাবে এই পরিস্থিতি মোকাবিলা করলেন?

বদর যুদ্ধে রাসূল ﷺ তাঁর সৈন্যদের অভিনব ফরমেশনে সাজালেন। ইংরেজি শেপের মতো সমান্তরাল দুই লাইনে সৈন্যরা দাঁড়াল। উভয়ের পিঠ উভয়ের দিকে। মাঝখানে আড়াআড়িভাবে সৈন্যদের এক লাইন।[৫] এর ফলে হলো কি, শত্রুবাহিনী কোনোদিক থেকেই মুসলিম বাহিনীকে চেপে ধরতে পারল না। তিনি তাঁর বাহিনীর কিছু অংশকে বৃষ্টির পানি জমে যেখানে খাবার পানি জমে ছিল, সেটার নিয়ন্ত্রণে রাখলেন। এরপর উপর থেকে সবকিছু দেখার জন্য এবং আদেশ দেওয়ার জন্য তিনি উঁচু জায়গা থেকে যুদ্ধ তত্ত্বাবধান করলেন। সবাইকে চমকে দিয়ে এই যুদ্ধ মুসলিমগণ জয় করে নেন। ৭০ জন কাফের নিহত হয়। আরও ৭০ জন বন্দী হয়।

উহুদ পাহাড়

বদর যুদ্ধের একবছর পর কুরাইশদের সাথে মুসলিমদের আবার যুদ্ধ বাধে। এবার তারা অনেক বড়সড় বাহিনী নিয়ে অগ্রসর হয়। তাদের সাথে ছিল ৩ হাজার যোদ্ধা, ৩ হাজার উট, ২শ ঘোড়া। যুদ্ধের ময়দানে চিয়ার আপ করার জন্য ছিল নারী। কুরাইশ বাহিনী মদিনার দক্ষিণ দিক থেকে এগোয়। কিন্তু

আগ্নেয় পাহাড়ের মতো জায়গার কারণে উটের গতি কমে যায়। যে কারণে তারা পরে উত্তর দিক থেকে এগোয় উহুদ পাহাড়ের দিকে। এটি মদিনার সবচেয়ে উঁচু পাহাড়। সাগরপৃষ্ঠ থেকে উচ্চতা প্রায় ১ হাজার মিটার। রাসূল ﷺ-এর বাসা থেকে এর দূরত্ব চার কিলোমিটার।

এই যুদ্ধে মুসলিমরা এমনভাবে অবস্থান নিয়েছিল যে, উহুদ পাহাড় ছিল তাদের পেছনে। যেখান থেকে তাদেরকে মাড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই, যদি না কুরাইশ বাহিনী ৭০০ মিটার উঁচু পাহাড় পথ পার না করে। তাও আবার সেটা রাসূল ﷺ ৫০ জন সৈন্য দিয়ে পাহারা দিয়ে রেখেছেন। কড়া নির্দেশ দিয়েছেন জয়-পরাজয় যা-ই হোক, কেউ যেন জায়গা ছেড়ে একচুলও না-নড়ে। মুসলিম বাহিনীর সাতশ সৈন্যকে রাসূল ﷺ আদেশ দিয়েছিলেন ব্যক্তিগতভাবে না লড়ে একাট্টা হয়ে যুদ্ধ করতে। কারণ চারগুণ বেশি কুরাইশ বাহিনীর সাথে ব্যক্তিগতভাবে লড়লে ময়দান থেকে মুহূর্তেই তারা হাওয়া হয়ে যাবে।

দুই বাহিনী মুখোমুখী হলো। প্রাথমিক পর্যায়ে মুসলিমরা সুবিধাজনক অবস্থানে ছিল। উঁচু টিলার ওখানে যে ৫০ জন দাঁড়িয়ে ছিলেন তারা ভেবেছিলেন যুদ্ধে মুসলিমরা জিতে গেছে। তারা পলায়নপর কুরাইশদের থেকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ নেওয়ার জন্য তাদের জায়গা ছেড়ে দিয়েছিলেন। পাহাড় অরক্ষিত থাকার পুরো সুযোগ সেদিন কুরাইশ বাহিনী নিয়েছিল। তারা আবার জড়ো হয়ে মুসলিমদের পরে পরাজিত করে।

নেতৃত্ব শিক্ষা (এক)

- **ক্ষমা করুন:** কাউকে শেখাতে বা গড়ে তুলতে সময় লাগে। কখন ক্ষমা করলে ভালো হবে সেটা জানলে ভালো ফল পাবেন। যারা পাহাড়ের নিচে দাঁড়িয়ে ছিল রাসূল ﷺ তাদের কঠোর তিরস্কার করেছিলেন। কিন্তু মাত্রা ছাড়িয়ে যাননি। অনুরূপভাবে ভুল করলে আপনার কর্মচারী বা সন্তানের সাথে মাত্রাতিরিক্ত কঠিন হবেন না। সেক্রেতান বলেছেন- 'অহম বলে ন্যায্য হও। আত্মা বলে দরদি হও'।[৬]

  আল্লাহ তায়ালা বলেন,

  'তুমি তাদের সাথে কোমল ছিলে। তুমি যদি তাদের সাথে রূঢ় হতে এবং কঠিন হৃদয় হতে, তাহলে তারা তোমাকে ছেড়ে চলে যেত। তাদের ক্ষমা কর। তাদের জন্য ক্ষমা চাও। সলাপরামর্শ কর'। আলে ইমরান : ১৫৯

- **সবকিছু জানুন:** নিজে যদি দক্ষ না-হন, নিজের ভূমিকা নিজেই না জানেন, তাহলে নেতা হিসেবে কীভাবে অন্যদের শ্রদ্ধা অর্জন করবেন?[৭] রাসূল ﷺ ৭০ জন যোদ্ধাকে কুরাইশ বাহিনীকে পর্যবেক্ষণ করার জন্য পাঠিয়েছিলেন। তিনি তাদেরকে বলে দিয়েছিলেন, যদি কুরাইশরা ঘোড়ায় চড়ে আসে, তাহলে তারা মদিনায় হামলা করবে (ঘোড়া ব্যবহৃত হতো দ্রুত গতি আর কম দূরত্বের নড়াচড়ার জন্য) আর যদি তারা উটে চড়ে আসে তাহলে তারা মক্কায় ফিরে যাবে (উট দুর্গম পথ পাড়ি দেওয়ার জন্য ভালো)।
- নজর: পরিস্থিতি যত কঠিনই হোক দাপুটে নেতারা মাথা ঠাণ্ডা রাখতে জানেন। কঠিন পরিস্থিতি যেন আপনাকে ঘায়েল করে না-ফেলে। নইলে দেখা যাবে বাজে সময়ে বাজে সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন। উহুদ যুদ্ধে রাসূল ﷺ চোট পেয়েছিলেন। মুসলিমদের ৭০ জন শহিদ হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি মাথা ঠাণ্ডা রেখেছিলেন। সেই মুহূর্তের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় যা যা করা দরকার করেছিলেন। সমস্যা জর্জরিত বাহিনীকে বৈরী অঞ্চলে ২০ কিলোমিটার মার্চের জন্য আবার একত্র করেছিলেন।

পরিখার যুদ্ধ

মক্কার কাফের ও মদিনার মুসলিমদের মধ্যে তৃতীয় ও চূড়ান্ত নিষ্পত্তিকারক যুদ্ধ হচ্ছে পরিখার যুদ্ধ। উহুদ যুদ্ধের দুবছর পর মক্কার কাফেররা আবার যুদ্ধের জন্য এগোয়। এবার তাদের লক্ষ্য ছিল গোটা মদিনা দখল। তাদের সঙ্গে ছিল ১০ হাজার সৈন্যের বিশাল বহর। ভাড়াটে সৈন্যও ছিল।

ঘটনা জানতে পেরে রাসূল ﷺ দ্রুত তিন হাজারের মতো সৈন্য জড়ো করেন। মদিনার শিশু আর অযোদ্ধাদের দুর্গের মধ্যে নিরাপদে থাকার জন্য পাঠান। প্রকৃতিগতভাবে মদিনার অবস্থান এমন ছিল যে, বেশিরভাগ দিক থেকেই একে রক্ষা করা যেত। ঘন গাছগাছালির সারি এবং আগ্নেয় শিলাখণ্ড অশ্বারোহী সেনাদলদের রুখে দিত। তবে উত্তর দিকটা খোলা ছিল। রাসূল ﷺ সে দিকটা পরিখা খনন করে সুরক্ষিত করার সিদ্ধান্ত নিলেন। বায়জেন্টাইন আর পারস্যদের আপাত অনিঃশ্বেষ যুদ্ধে পরিখা খনন করা হতো তখন। শত্রুদের অতর্কিত হামলা থেকে শহর রক্ষার জন্য রক্ষণাত্মক কৌশল হিসেবে এটা ব্যবহৃত হতো। ইউরোপে প্রথম

বিশ্বযুদ্ধেও এই কৌশল ব্যবহৃত হয়েছিল। আরবরা অবশ্য আগে কখনো এটা দেখেনি। পারস্য দেশ থেকে আসা সাহাবী সালমান ফারসি এই বুদ্ধি দেন। রাসূল ﷺ তাতে সায় দেন। মুসলিমরা ২২ ফুট বাই ৯ ফুট পরিখা খনন করেন। এর দৈর্ঘ্য ছিল তিন কিলোমিটার।

নেতৃত্ব শিক্ষা (দুই)

- **সিদ্ধান্তে অটল থাকুন:** সময়টা ছিল মার্চ। মদিনায় তখন শীতের মৌসুম। তার ওপর হাতে খুব বেশি সময়ও ছিল না। এমন বৈরী সময়ে এত বড় পরিখা খনন ভীষণ খাটাখাটুনির ব্যাপার ছিল। কিন্তু রাসূল ﷺ তাঁর সিদ্ধান্তে অটল ছিলেন।
  আপনিও নিজের সিদ্ধান্তে অটল থাকুন। করবেন কী করবেন না এমন ভাবতে ভাবতে সুযোগ হারাবেন না। সুযোগ অনেক থাকতে পারে কিন্তু সময় কম। সবকিছু জড়ো করুন, সময় নির্ধারণ করুন, আপনার সিদ্ধান্তের সাথে আপনার ইনসটিঙ্কট বা স্বাভাবিক মনোভাব যায় কী না দেখুন। এরপর আল্লাহর ওপর ভরসা করে এগিয় যান।
- **উদ্দীপ্ত করুন:** 'কঠিন সময়ে যেসব নেতা হাসেন এবং মজা করেন, তারা সেনাদের মধ্য থেকে দুঃচিন্তা দূর করেন। আত্মবিশ্বাসের দ্যুতি ছড়ান'।[৮]
  মদিনার বেশিরভাগ লোকজনের কাছে স্বাভাবিকভাবেই পরিখা খননের কাজ আকর্ষণীয় ছিল না। আরবরা মুখোমুখী যুদ্ধে গর্ব করে। পরিখা খোঁড়ার মতো অরোমাঞ্চকর কাজে তাদের অনাগ্রহ স্বাভাবিক। কিন্তু রাসূল ﷺ তাদেরকে প্রচণ্ডভাবে উদ্দীপ্ত করেছিলেন। নইলে মাত্র ছয় দিনে তিন কিলোমিটার পরিখা খনন সম্ভব ছিল না।
- **নিজে হাত লাগান:** তিনি দশ জন করে একেকটা গ্রুপ বানান। প্রত্যেক গ্রুপকে দায়িত্ব দেন ৩০ মিটার করে খোঁড়ার জন্য। নিজেও তাদের সাথে হাত লাগান।
  বুখারীর এক হাদীসে এক প্রত্যক্ষ্যদর্শীর বলেছেন, 'আমি দেখেছি তিনি গর্ত থেকে মাটি বহন করে নিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর পেট পর্যন্ত ময়লাকাদায় ভরে গিয়েছিল'। আপনার সন্তানরা যা করছে তার সাথে যোগ দিন। কর্মচারীদের কাজের বুঝা কমান।

- **সৃষ্টিশীলতাকে উৎসাহিত করুন:** কথা বলার, মত প্রকাশের স্বাধীনতার মতো পরিবেশ যদি রাসূল না-দিতেন তাহলে সালমান ফার্সি পরিখা খননের মতো অভিনব বুদ্ধি আরবদের সামনে তুলে ধরতে পারতেন না। হাসি তামাশা করে কেউ তার বুদ্ধিকে উড়িয়ে দেয়নি; বরং সবাই বেশ উৎসাহের সাথে নিয়েছিল। এর সুবিধা-অসুবিধা নিয়ে সিরিয়াসলি আলোচনা করে তবেই গ্রহণ করেছে।

অবরোধ

ভয়ানক এই পরিখা দেখে কাফের বাহিনী পুরোপুরি অপ্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল। বুঝতে পারছিল না যে কী করবে। পরিখার খোঁড়া মাটি দিয়ে তারা উঁচু টিলা বানিয়ে সেটার উপর বসে ছিল যাতে তাদেরকে অতিক্রম করতে না-পারে।

দুই দল একে অপরকে দেখতে পাচ্ছিলো। কাফের বাহিনী মুসলমিদের বিদ্রুপ করছিল। লড়াইয়ের জন্য উস্কে দিচ্ছিল। 'তোমরা এক গর্তের পেছনে হাত গুটিয়ে বসে আছ? তোমাদের বাপদাদারা কি এভাবে গর্ত খুঁড়ে তার পেছনে লুকিয়ে থাকত? লড়াই করতে ভয় পেত? তোমরা কোনো আরব যোদ্ধার জাত না'!

কখনো কখনো মুসলিমরা তাদের বিদ্রুপের জবাব দিয়েছে। কাফের বাহিনী মদিনায় প্রবেশের জন্য ভিন্ন পথ খুঁজল। পশ্চিম দিকে ইহুদি গোত্রের সাথে কথা বলল। কিন্তু কোনো লাভ হলো না। একদিকে রসদ কম অন্যদিকে ঠাণ্ডা বালুঝড়ে ওদের মনোবল কমে গেল। একমাস অবরোধের পর কোনো ধরনের যুদ্ধ ছাড়াই তারা চলে গেল।

শান্তি

মুসলিম-অমুসলিমদের লেখা কিছু জীবনীতে রাসূল ﷺ-এর জীবনের জিহাদগুলোতে বেশি নজর দেওয়া হয়। কিন্তু রাসূল ﷺ-এর গোটা জীবনে খুব কম অংশ জুড়েই ছিল জিহাদ। তিনি সন্তানসন্ততি আর নাতিদের নিয়ে স্বাভাবিক পারিবারিক জীবন কাটিয়েছেন। তার সরল-সিধা জীবন ও আড়ম্বরহীনতার কারণে সবাই তাকে ভালোবাসতেন। জিহাদ ছিল তাঁর সর্বশেষ পন্থা। যখন আর কোনো উপায় ছিল না, তখন শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি যুদ্ধে নামতেন। পরিখার যুদ্ধের এক বছর পর কুরাইশদের সাথে তিনি শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন।

রাসূল ﷺ যখন সাহাবীগণকে নিয়ে উমরার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেন, তা শুনে কুরাইশরা হকচকিয়ে গিয়েছিল। কিংকর্তব্যবিমূঢ়। কাবায় আসা থেকে তারা তাকে বাধাও দিতে পারছিল না। আবার তাকে আসতেও দিতে চাচ্ছিল না। তাই কাবায় আসার আগেই তারা তাঁর পথ আটকে দেয়। রাসূল ﷺ তখন পথ বদলে মক্কা থেকে ১১ কিলোমিটার পশ্চিমে হুদায়বিয়াতে যান। কী হয় দেখার জন্য অপেক্ষা করেন।

কুরাইশরা ভেবেছে তিনি উমরার উসিলায় মক্কা দখল করতে এসেছেন। তিনি অবশ্য সেটা অস্বীকার করেছেন। তাঁরা দেখালেন যে, আত্মরক্ষার জন্য ছুড়ি জাতীয় কিছু অস্ত্র ছাড়া তাদের সাথে কোনো ভারী অস্ত্রসস্ত্র নেই। আবার এগুলো তারা হারামে প্রবেশের সময় সাথে নেবেনও না। কুরাইশ দূত মক্কায় ফিরে কুরাইশ নেতাদের বুঝান যে, রাসূল ﷺ আর তাঁর সাহাবীগণ উমরার জন্য মক্কায় আসতে পারেন।

কুরাইশদের আশ্বস্ত করার জন্য তিনি বিভিন্ন পদ্ধতি নেন। নেগোশিয়েশন ও পার্সুয়েশন কৌশল নিয়ে আজকাল যেসব লেখালেখি হয় সেগুলোতে এগুলো পাওয়া যায়। যেমন যাকে আশ্বস্ত করতে চাচ্ছেন তার প্রকৃতি ও স্বভাব বুঝা।

আহাবিশ যে গোত্র প্রধান দূত হয়ে এসেছিলেন, তিনি আল্লাহর জন্য পশু কুরবানী পছন্দ করতেন। তো যখন রাসূল ﷺ তাকে আসতে দেখলেন, তিনি তার সামনে ভেড়া ও অন্যান্য যেসব জিনিস তারা কুরবানীর জন্য এনেছিলেন সেগুলো হাইলাইট করে রাখলেন। এগুলো দেখে তার খুব ভালো লাগল। মক্কায় ফিরে যেয়ে শান্তিপূর্ণভাবে মুসলিমদের উমরা পূরণে তিনি কুরাইশদের বলতে লাগলেন।

কীভাবে অন্যদের রাজি করাবেন?

- **নিজের মানুষদের জানুন:** যাদের নিয়ে আপনার কাজ, তাদের ব্যাপারে জানুন। যেমন তাদের সামাজিক ব্যাকগ্রাউন্ড, শিক্ষাদীক্ষা, আগ্রহ ইত্যাদি। নির্ণয় করার চেষ্টা করুন আপনার আইডিয়া ছড়িয়ে দিতে কোন জিনিসটা প্রভাব ফেলতে পারে। হতে পারে তা কোনো যুক্তিচিন্তাভিত্তিক পয়েন্ট, আবেগময় কথা বা তার আগের বিশ্বাসের প্রতি আবেদন ইত্যাদি। মক্কা থেকে যে-দূত এসেছিলেন রাসূল ﷺ তার ব্যক্তিত্বের ব্যাপারে যা জানতেন তা কাজে লাগিয়েছিলেন।

আহাবিশরা যে কাবায় হজ্জ করতে আসাদের কী পরিমাণ সম্মানের চোখে দেখতেন এটা তিনি জানতেন। এজন্য তাঁরা যে কেবল হজ্জের জন্য এসেছেন তার প্রমাণ দেখাতে পেরেছিলেন।

- **নিজের বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়ান:** আপনার কথাবার্তার মাত্র ৭ ভাগ মানুষের মনে ছাপ ফেলে। আপনার আচারআচরণের প্রভাব ৫৩ ভাগ। রাসূল ﷺ-এর ওপর আগে একসময় হামলা করেছিল এমন ৪০ জন মাক্কী বন্দীসেনাকে হুদায়বিয়াতে ক্ষমা করে ছেড়ে দিয়েছিলেন। এটা কুরাইশদের বিব্রতকর অবস্থায় ফেলে দিয়েছিল, কারণ আরবদের ঐতিহ্য অনুযায়ী কেবল মুক্তিপণের বিনিময়েই বন্দীদের ছেড়ে দেওয়া হতো। কথার চেয়ে কাজের ক্ষমতা বেশি।
- **কীভাবে নিজের আইডিয়া মার্কেট করতে হবে জানুন:** বিভিন্ন দূতিয়ালীদের সাথে রাসূল ﷺ-এর আচরণ বিভিন্ন ছিল। কিন্তু মূলকথা একই ছিল: আমরা যুদ্ধ করতে আসিনি, [কাবা] প্রদক্ষিণ করতে এসেছি'। এই কথা কুরাইশদের কানে বারবার অনুরণিত হয়ে থাকবে। তারা জানত এই মুহূর্তে যুদ্ধ মক্কার স্থিতিশীলতা নষ্ট করবে, অন্যদিকে ১৪০০ হজ্জযাত্রী এলে আর্থিকভাবে তাদের লাভ হবে।

অচলাবস্থা নিরসন

শেষপর্যন্ত কুরাইশরা রাজি হলো যে, তারা হজ্জ করতে পারবে তবে এবছর না। আগামী বছর। দশকব্যাপী শত্রুতা এভাবেই শেষ হলো।

মুসলিমদের কাছে এই চুক্তি অবশ্য অন্যায্য মনে হয়েছিল। কারণ, তারা উমরার সব প্রস্তুতি নিয়ে এসেছিল। দেরি হোক এমনটা তারা চাননি। তাছাড়া চুক্তিতে আরেকটা কথা ছিল যে, যারা মক্কা ছেড়ে এসেছে তাদেরকে মুসলিমরা ফিরিয়ে দেবে। কিন্তু কেউ যদি মদিনা ছেড়ে আসে, তাহলে তাকে ফিরিয়ে দিতে কুরাইশরা বাধ্য থাকবে না।

যাহোক, শেষমেষ তারা চুক্তির শর্ত মেনে নেয়। কারণ রাসূল ﷺ একে তাদের বৃহৎ স্বার্থের জন্য দেখেছেন। বিষয়টাকে তিনি শুধু অন্য আদল থেকে দেখেননি; বরং প্রথমে যারা চুক্তিটাকে অন্যায্য ভেবেছিল তাদেরকেও তিনি তা বুঝাতে পেরেছিলেন। রাসূল ﷺ কীভাবে হুদায়বিয়ার শান্তিচুক্তির ফায়দা অন্যান্য মুসলিমদের বুঝালেন? আপনি কীভাবে অন্যদের সহজে বুঝাতে পারবেন?

প্রতিপক্ষকে কীভাবে বুঝাবেন?

- **শুনুন:** ব্যালডোনি তার ইন্সপায়ার, হোয়াট গ্রেট লিডারস ডু বইতে দেখিয়েছেন যে, লোকজনদেরকে তাদের ভিন্নমত বলতে দেওয়াটা গুরুত্বপূর্ণ।
  'এটা কেবল ভিন্নমত দেওয়ার বিষয় না; বরং সত্যিকার অর্থে ভিন্নমত স্বীকার করা।' ব্যালডোনি, ১০৮-১০৯
  কোনো ধরনের বাধা, তিরস্কার বা রায় দেওয়া ছাড়া রাসূল ﷺ তাঁর সাহাবীগণকে তাদের হতাশা প্রকাশের সুযোগ দিয়েছিলেন।
- **লাগতে যাবেন না:** জোরাজোরি না করে যুক্তি, প্রমাণ ব্যবহার করে রাজি করানোর মাধ্যমে বুঝান। রাসূল ﷺ তাঁর সাহাবীগণকে বললেন, কুরবানী করতে। মাথা চেছে ফেলতে। তারা যখন করলেন না, তখন তিনি নিজেই শুরু করলেন। বাকিরা পরে তাঁকে অনুসরণ করতে বাধ্য হলো। তিনি তাদের মন বদলে দিয়েছিলেন প্ররোচনার মাধ্যমে। নিজের দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি জোরাজোরি না করে।

মক্কায় প্রবেশ

হিজায অঞ্চলে মুসলিমদের প্রভাব বাড়িয়ে তিনি যুদ্ধবিরতি চুক্তির সুব্যবহার করে তাঁর নিন্দুকদের ভুল প্রমাণ করেছিলেন। মদিনার আরও প্রতিবেশীদের সাথে তিনি চুক্তি করেন। এগুলো কুরাইশদের কাফেলার নিরাপত্তার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল। যুদ্ধবিরতি চুক্তি অন্যান্য গোষ্ঠীগুলো কার সাথে মিত্রতা করবে, এটা বাছাই করার স্বাধীনতা দিয়েছিল। বেশিরভাগ গোষ্ঠী যারা কুরাইশদের বাণিজ্য রুটে ছিল তারা মদিনাকে বেছে নিয়েছিল। পরের বছর রাসূল ﷺ মক্কায় প্রবেশ করেন চুক্তির শর্ত অনুযায়ী। প্রায় ১ হাজার ৪শ সাহাবী নিয়ে হজ্জ পালন করেন। শান্তিপূর্ণভাবে পালন করার তিন দিন পর মক্কা ছাড়েন।

নিজের প্রভাব বাড়ান

আপনার জীবনে দুটো অংশ আছে। যাদের ওপর আপনার প্রভাব আছে। আর যাদের নিয়ে আপনি উদ্বিগ্ন। যাদের ওপর আপনার প্রভাব আছে সেগুলো হচ্ছে- যা আপনি নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। অন্যদিকে উদ্বিগ্নের বলয় হচ্ছে- যেসব জিনিস আপনার কাছে গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু এর নিয়ন্ত্রণ আপনার হাতে নেই।[৯]

চ্যালেঞ্জ হচ্ছে, আপনার প্রভাব বলয় বাড়ানো, যাতে এটা উদ্বিগ্ন বলয়ে পৌছায়। রাসূল ﷺ তাঁর প্রভাব বলয় বাড়িয়েছিলেন হিজাযের বিভিন্ন

গোষ্ঠীর সাথে মিত্রতা স্থাপন করে। যেটা পরে তাঁর উদ্বিগ্ন বলয়ে (মক্কা) প্রভাব ফেলেছিল কুরাইশদের বাণিজ্য কাফেলার মাধ্যমে।

মক্কায় হজ্জ পালনের পর এক সহিংসতার কারণে যুদ্ধবিরতি চুক্তি ভেঙে যায়। কুরাইশ সমর্থিত এক গোষ্ঠী মুসলিমদের সাথে মিত্রতা স্থাপনকারী এক গোষ্ঠীর ওপর হামলা করে। এর পেছনে সামরিকভাবে মদদ দিয়েছিল কুরাইশরা। কিন্তু চুক্তি অনুযায়ী তা ছিল নিষিদ্ধ। কুরাইশরা এ ঘটনার জন্য দুঃখজ্ঞাপন করে, কিন্তু রাসূল কোনোভাবেই নিশ্চিত হতে পারছিলেন না যে এমন ঘটনা আর ঘটবে না। তাই তিনি তাদের সেই দুঃখপ্রকাশ প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি ১০ হাজার সৈন্য জড়ো করেন সামরিক অভিযানের জন্য।

মক্কার বাইরে মুসলিমদের এই বিশাল বাহিনী দেখে কুরাইশরা বিনা যুদ্ধে আত্মসমর্পণ করে। রাসূল ﷺ পুরো শহরের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেন। সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন। যদিও সেই সময়ের আরব উপদ্বীপের রীতি অনুযায়ী সব পুরুষদের হত্যা এবং নারীদের দাসী বানানোর পুরো অধিকার তাঁর ছিল।

নবি ﷺ জীবনের শেষ

মক্কা বিজয়ের পর রাসূল ﷺ মদিনায় ফিরে আসেন। হিজাজের বড় বড় গোষ্ঠীগুলো থেকে তাঁর কাছে প্রতিনিধিদল আসে। তিনি তাদের অভ্যর্থনা জানান। ইসলামে আসার অনুরোধ জানিয়ে পারস্য, সিরিয়া ও মিশরের রাজনৈতিক নেতাদের কাছে চিঠি লিখিয়ে পাঠান।।

আরবের ১ লাখ ৪০ হাজার মানুষ নিয়ে পরে তিনি হজ্জ পালন করেন। সেখানে তিনি ঐতিহাসিক বিদায় হজ্জের ভাষণ দেন। ন্যায়বিচার আর নারীদের প্রতি সম্মানের বিষয় তুলে ধরেন ('অন্যায় কোরো না... যা ঠিক তা নিয়ে নারীদের সঙ্গে আলোচনা করো... আমি যা বলছি তা শোনো, বিবেক খাটাও')। হজ্জ শেষে তিনি আবার মদিনায় ফিরে যান।

'লা ভিয়ে দে মাহোমেত' বইতে কন্সটান্টিন গেওরগিউ রাসূল ﷺ-এর ভাষণ কতটা আলোড়ন সৃষ্টিকারী ছিল, সে ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে লিখেছেন-

> 'আমরা নবির কণ্ঠ শুনিনি। তার সময়ে ছিলাম না। তার সাথেও থাকিনি। কিন্তু তারপরও আমরা যখন তাঁর ভাষণ পড়ি, তখন আমরা তার শব্দের ঝনঝনানিতে আলোড়িত হই। আমাদেরই যখন এই অবস্থা, তাহলে সেদিন সেখানে যারা উপস্থিত ছিলেন

তাদের অবস্থা কেমন ছিল? সেই সম্ভ্রম-জাগানিয়া মুহূর্ত তাদের পক্ষে বুঝি কখনো ভোলা সম্ভব ছিল না। কারণ তারা রাসূল ﷺ-এর কথায় অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। শুধু কান দিয়ে নয়, হৃদয় ও মন দিয়ে তাঁর কথা গেঁথে নিয়েছিলেন'।[১০]

রাসূল ﷺ-এর নেতৃত্বগুণ থেকে ফায়দা

রাসূল ﷺ-এর নেতৃত্ব	আপনার নেতৃত্ব
খুব দ্রুত রাসূল ﷺ মদিনার বাস্তবতা বুঝে সে অনুযায়ী সংস্কার শুরু করেছিলেন।	কী বদলানো যাবে আর যাবে না-সেটা জানার জন্য বদলানোর আগে নিজের বাস্তবতা বুঝুন।
পরিখা খননের সময় কোনো কোনো হিজরতকারী মুসলিম যখন কাজটাকে ছোট করে দেখছিলেন, তখন রাসূল ﷺ নিজেই হাত লাগান।	শুধু উপর থেকে আদেশ দেবেন না। নিজেই নজির স্থাপন করুন। তাদেরকে যা অর্জন করতে বলছেন তার সাথে নিজেও যোগ দিন।
দায়িত্ব, অধিকারের ওপর ভিত্তি করে রাসূল ﷺ মদিনার লোকদের মধ্যে সম্পর্ক জুড়ে দেন। সবাইকে শহরের শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য দায়ী করেন।	যাদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন শুধু তাদের ভূমিকা ও দায়িত্বের ওপর নজর না দিয়ে তাদের মধ্যে মানবিক সম্পর্ক গড়ে দিন।
তিনি ভুল ধরতেন, তবে যিনি ভুল করেছেন। তাকে দোষারোপ করতে করতে সেটা নিয়ে বাড়াবাড়ি করতেন না।	ভুল ক্ষমা করে দিন। অন্যকে তিরস্কার ও অপদস্থ করার জন্য নিজেকে সঠিক প্রমাণ করার চেষ্টায় বাড়াবাড়ি করবেন না।
রাসূল ﷺ সতর্ক পর্যবেক্ষণ ও নির্ভুল তথ্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিতেন।	নিজের কাজের ব্যাপারে সর্বশেষ তথ্য সম্পর্কে জেনে রাখুন। যাতে আপনার সর্বাধুনিক নেতৃত্ব দিয়ে সবার শ্রদ্ধা জয় করতে পারেন।
অন্যকে রাজি করানোর ক্ষমতা তার ছিল (যেমন হুদায়বিয়াতে বনিবনায়)	যার সাথে বনিবনা করতে যাচ্ছেন তার স্বভাবপ্রকৃতি জানুন। তার কথা শুনুন। তার উদ্বেগ নিয়ে তার সাথে কথা বলুন।

রাসূল ﷺ-এর মৃত্যু

জীবনের শেষ দিনগুলোতে রাসূল ﷺ ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়েন। তিনি তখন বসে বসে সালাত পড়তে শুরু করেন। অন্যের সাহায্য ছাড়া হাঁটতে পারতেন না। রাসূলের চাচা হযরত আব্বাস ﷺ তাঁর তীব্র জ্বর ও ক্রমাগত মাথাব্যথা নিয়ে বলেছেন, 'আবদুল মুত্তালিবের বংশধররা যখন মারা যায়, তখন তাদের চেহারা কেমন হয় আমি জানি'।

মসজিদে শেষ ভাষণে তিনি ইঙ্গিত দেন যে, তার দিন ফুরিয়ে আসছে। কাউকে কষ্ট দিয়ে থাকলে সেজন্য তিনি ক্ষমা চান।

> 'আমি যদি কারও পিছনে আঘাত করি, তাহলে সেটা আমার নিজের পেছনেই করেছি। কারও সম্পত্তি নিয়ে থাকলে সেটা নিজের সম্পদই অন্যায়ভাবে গ্রাস করেছি। কারও সম্মান নষ্ট করলে আমার করেছি'।

অসাধারণ অনুপ্রেরণামূলক জীবন কাটিয়ে ৬৩ বছর বয়সে রাসূল ﷺ তাঁর পরম বন্ধুর ডাকে সাড়া দিয়ে ইহলোক ত্যাগ করেন।

আপনার মিশন শুরু

আমরা বইয়ের একদম শেষে চলে এসেছি। আপনার মিশন এখন শুরু হতে যাচ্ছে।

অসাধারণ আর স্মার্ট হওয়া নির্দিষ্ট কোনো দক্ষতার সাথে সম্পর্কিত না। কারণ সময় দ্রুত বদলে যাচ্ছে। দক্ষতার প্রয়োজনীয়তাও বদলে যাচ্ছে। এই বইতে প্রাথমিক পর্যায়ের যেসব দক্ষতার কথা বলা হয়েছে সেগুলোর বেলাতেও এটা খাটে। যেমন আবেগময় বুদ্ধিবৃত্তি, শেখার জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা, নিজের প্রভাব, বিশ্বাসযোগ্যতা, উদ্ভাবনী কৌশল বাড়ানো ইত্যাদি। নেতৃত্বের বিষয়টাই প্রতিনিয়ত বদলে যাচ্ছে।

দক্ষতাগুলো নিয়ে অলস বসে থাকা আপনার মিশন না; বরং অর্জন করার জন্য বা আরও বিকশিত করার জন্য সক্রিয়ভাবে সেগুলো চর্চা করা এবং যুগের প্রয়োজনের সাথে তাল মিলিয়ে চলার জন্য নিজের দক্ষতাগুলো হালনাগাদ করা আপনার মিশন। এজন্য দুটো জিনিস দরকার-

- 'বিকশিত' শব্দটা বলতে যা যা বুঝায় করুন। ট্রেনিং সেশনে অংশগ্রহণ করুন, আত্মউন্নয়নমূলক বই পড়ুন, অনুপ্রেরণাদায়ী লোকজনদের সাথে মিশুন, যারা আপনাকে সমর্থন করে তাদের নিয়ে আপনার বলয় তৈরি করুন।
- রাসূল ﷺ-এর জীবন নিয়ে পড়াশোনা চালিয়ে যান। কীভাবে নিজেকে বিকশিত করবেন, অন্যান্যদের সাথে রাসূল ﷺ-এর কথাবার্তা, চালচলন কেমন ছিল, সেসব লাইফ স্কিলগুলো জানুন।

আপনি যদি ধার্মিক মুসলিম হোন এবং বলেন যে, আপনি এরই মধ্যে রাসূল ﷺ-এর চিরায়ত জীবনী কয়েকবার পড়েছেন, তাহলে আপনি রাসূল ﷺ-এর জীবনী পড়ে আর নতুন কিছু পাবেন না। শুধু ঘটনা জানার জন্য বলে থাকলে আপনি ঠিক বলেছেন। কিন্তু যদি একই ঘটনা অন্য আলোয় পড়তে চান, জানতে চান, তাহলে একটা সীরাহ গ্রন্থ বা জীবনী বই পড়া মোটেও যথেষ্ট না। আপনাকে লাগাতার পড়ে যেতে হবে ভিন্নভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির জন্য, কারণ প্রত্যেক যুগ রাসূল ﷺ-এর জীবনী সেই যুগের চাহিদা ও সমস্যার আলোকে লিখবে।

আশা করি, এই বই ইতিহাস ও আধুনিক জীবনের অনুপ্রেরণাদায়ী বিভিন্ন উদাহরণ পড়ার ক্ষুধা বাড়িয়ে দিয়েছে। এ ধরনের অনেক ঘটনাই পাওয়া যাবে আশেপাশে। আর কে জানে, হয়ত পরের প্রজন্মের জন্য আপনি নিজেই হয়ে উঠবেন সেরকম একজন!

প্রান্তটীকা

মুহাম্মাদ ﷺ-এর শিশুকাল

১. দেখুন- সেভের, হাউ টু বিহেভ সো ইয়োর চিলড্রেন উইল, টু!
২. দেখুন- রামিরেজ, 'প্যারেন্টিং টিপস: গিভিং ইয়োর চিলড্রেন দ্যা গিফট অফ টাইম'।
৩. দেখুন- ব্রুস, লার্নিং থ্রু প্লে।
৪. রাসূল একদিন বাচ্চাকাচ্চাদের সাথে খেলছিলেন। এমন সময় ফেরেশতা জিবরাঈল (আ) এসে তাকে মাটিতে শুইয়ে দিলেন। তাঁর বুক কেটে হৃদপিণ্ড বের করে সেখান থেকে কালো এক রক্তপিণ্ড ফেলে দেন। ফেলে দিতে দিতে বলেন, 'শয়তানের এই অংশটাই শুধু আপনার মধ্যে ছিল'। স্বর্ণের এক পাত্রে ঠাণ্ডা পানিতে তিনি এরপর তার হৃদপিণ্ড ধুয়ে আবার জায়গামতো বসিয়ে দেন। কাটা জায়গাটা সেলাই করে এরপর তিনি চলে যান। (সালাহি, পৃষ্ঠা ২৭)
৫. গর্গিউ, পৃষ্ঠা- ১২
৬. আরও টিপসের জন্য দেখুন- রামসি, ফাইভ হান্ড্রেড ওয়ান ওয়েজ টু বুস্ট ইয়োর চাইল্ড'স সেল্ফ এস্টিম।

রাসূল ﷺ-এর চারপাশ

১. ইসলামপূর্ব আরবের তথ্যগুলো নেওয়া হয়েছে, মুহাম্মাদ ইয্যাত দারুযা'র দ্য এজ অফ দ্য প্রফেট ﷺ অ্যান্ড হিজ এনভায়রোনমেন্ট বিফোর দ্য মিশন বই থেকে।
২. বৈরী পরিবেশে মুসলিম সমাজে খ্যাতিলাভকারী নারীদের ব্যাপারে আরও জানতে 'উইমেন ইন্সপায়ারড বাই দ্য বিলাভড' (লন্ডন, ২০০৭) নামে আমার অডিও লেকচার শুনুন।
৩. দেখুন- রুথ, স্ট্রেন্থস ফাইন্ডার ২.০।
৪. উকায বাজারের বেশিরভাগ তথ্য নেওয়া হয়েছে হাম্মুর রচিত সুক উকায ওয়া মাওয়াসিমুল হজ্জ বই থেকে।

মুহাম্মাদ ﷺ-এর কৈশোর

১. আরও টিপসের জন্য দেখুন: বিড্ডালফ, রেইজিং বয়েজ এবং একই লেখকের রেইজিং গার্লস।

তরুণ মুহাম্মাদ ﷺ

১. দারুযা, পৃষ্ঠা- ২১১।
২. সালাহি, পৃষ্ঠা- ৪৯।
৩. গর্গিউ, পৃষ্ঠা- ৪১।
৪. দেখুন: গ্ল্যাডওয়েল, বি-স্ক: দ্য পাওয়ার অফ থিঙ্কিং উইদাউট থিঙ্কিং; লেহরার, ইমাজিন: হাউ ক্রিয়েটিভিটি ওয়ার্কস; এবং আর্ডেন, দ্য বুক অফ ডুয়িং: এভরিডে অ্যাকটিভিটিস টু আনলক ইয়োর ক্রিয়েটিভিটি অ্যান্ড জয়।
৫. রাসূলের ইবাদতের ধরন নিয়ে এখানে বেশিরভাগ তথ্য নেওয়া হয়েছে আরবি ভাষায় লিখিত মুহাম্মাদ ইয্যাত দারুযা'র দ্য এজ অফ দ্য প্রফেট ﷺ অ্যান্ড হিজ এনভায়রোনমেন্ট বিফোর দ্য মিশন বই থেকে।

চল্লিশের কোঠায় রাসূল ﷺ

১. এই বিষয়ের ওপর আমি রিচার্ড কচ ও গ্রেগ লকউড-এর সুপার কানেক্ট: হারনেসিং দ্য পাওয়ার অফ নেটওয়ার্কস অ্যান্ড দ্য স্ট্রেন্থ অফ উইক লিঙ্কস বইটা পড়তে বলব।
২. সুইচ: হাউ টু চেঞ্জ থিংস হোয়েন চেঞ্জ ইজ হার্ড, চিপ হিথ ও ড্যান হিথ
৩. দেখুন: এম রায়ান, অ্যাডাপ্টিবিলিটি: হাউ টু সারভাইভ চেঞ্জ ইউ ডিডন্ট আস্ক ফর।

অধ্যায়- ৭

১. মদিনায় রাসূলের জীবনের বেশিরভাগ তথ্য নেওয়া হয়েছে সালিহ আল-আলী রচিত আরবি বই দ্য স্টেট অফ দ্য প্রফেট ইন মদিনা: আ স্টাডি ইন ইটস মেকিং অ্যান্ড অর্গানাইজেশন থেকে।
২. আদাইর, ৭৭।
৩. হুয়িটলি, পৃষ্ঠা ৪৯-৬০।
৪. আর্মস্ট্রং, পৃষ্ঠা ১২৮।
৫. গর্গিউ, পৃষ্ঠা ২১৯।
৬. সেকার্টান, পৃষ্ঠা ১৪৩।
৭. দেখুন: জেমস স্কোউলার, দ্য থ্রি লেভেলস অফ লিডারশিপ, পৃষ্ঠা ৭৮-১০৫।
৮. আদাইর, পৃষ্ঠা ৮১।
৯. উদ্বিগ্ন বলয় আর প্রভাব বলয় নিয়ে দেখুন, স্টিফেন কভে'র দ্য সেভেন হ্যাবিটস অফ হাইলি ইফেক্টিভ পিউপ্‌ল, পৃষ্ঠা ৮১-৯১।
১০. গর্গিউ, ৩৭৬।

Bibliography

Adair, John, The Leadership of Muhammad (Kogan Page, London, 2010).

Ahmad, Mahdi Rizqullah, As-Sirah al-Nabawiya fi Daw al Masadir al Asliyah (A Biography of the Prophet of Islam in the Light of the Original Sources: An Analytical Study), 2 Volumes (King Faisal Center for Research and Islamic Studies, Riyadh, 1992).

Ali, Salih, Dawlat al-Rasul fi al-Madinah: dirasah fi takawwuniha wa-tanzimiha (The State of the Prophet in Medina: A Study in its Making and Organization), (Sharikat al-Matbuat lil-Tawzi wa-al-Nashr, Beirut, 2009).

Apter, Terri, What Do You Want from Me? Learning to Get Along with In-Laws (W W Norton & Company, New York, 2009).

Arden, Allison, The Book of Doing: Everyday Activities to Unlock Your Creativity and Joy (Tarcher Perigee, London, 2012).

Armstrong, Karen, Muhammad: A Prophet for Our Time (Harper Collins, New York, 2006).

Baldoni, John, Lead by Example (American Management Association, New York, 2009).

Batnuni, M, Al-Rehlah Al-Hijaziyya (The Hijazi Journey) (Cairo, 1911).

Biddulph, Steve, Raising Boys: Why Boys Are Different and How to Help Them Become HapPz and Well-Balanced Men (Harper, London, 2015).

Biddulph, Steve, Raising Girls: Helping Your Daughter to Grow Up Wise, Warm and Strong (Harper, London, 2013).

Bruce, T, Learning Through Play: For Babies, Toddlers and Young Children (Hodder Education, London, 2011).

Burgoon, K, Buller, B and Woodall, G, Nonverbal Communication: The Unspoken Dialogue (McGraw-Hill, New York 1996).

Covey, Stephen, The 7 Habits of Highly Effective People (Pocket Book, Croydon, 2004).

Darouza, M, Asr an Nabi alayhi as-salam wa beatihi qabl al bi'etha (The Age of the Prophet [Peace be upon Him] and His Environment Before the Mission), (Dar Al-Yaqaza Al-Arabiyya, Beirut, 1964).

Gheorghiu, Constantin, La vie de Mahomet (translated from the Romanian by Livia Lamoure), (Éditions Plon, 1963; Éditions du Rocher, 1999).

Gladwell, Malcolm, Blink: The Power of Thinking Without Thinking (Penguin, London, 2006).

Godin, Seth, Tribes: We Need You to Lead Us (Hachette. London, 2011).

Hall. Zoe Dare, 'Living Together: Return of the Extended Family,' The Telegraph, 2 February 2008.

Hammour, I, Souq okaz wa mawasim al-hajj (The Souq of Okaz and the Hajj Seasons), (Muasasat al Rihab al Hadeetha, Beirut, 2000).

Heath. C and Heath, D. Switch: How to Change Things When Change Is Hard (Random House Business Books, London, 2011).

Ibn Hesham, M, Sirat-an-Nabi (Biography of the Prophet), (Cairo, 1990).

Koch. Richard and Lockwood, Greg, Superconnect: Harnessing the Power of Networks and the Strength of Weak Links (Little & Brown, London, 2010).

Lehrer, Jonah, Imagine: How Creativity Works (Houghton Mifflin Harcourt, London, 2012).

Lucas, Bill, R-Evolution: How to Thrive in Crazz (Crown House Publishing, Wales, 2009).

Ramirez, Laura, 'Parenting Tips: Giving Your Children the Gift of Time' http://parenting-child-development.com/ parenting-tips.html (accessed 15 April 2016).

Ramsey, Robert, 501 Ways to Boost Your Child's Self Esteem (Contemporary Books, Chicago, 2003).

Rayan. M. Adaptability: How to Survive Change You Didn't Ask For (Broadway Books. New York, 2009).

Salahi, Adil, Muhammad : Man and Prophet (The Islamic Foundation, Leicestershire, 2002).

Scouller, James. The Three Levels of Leadership (Management Books, Cirencester, 2011).

Secretan, Lance. Inspire: What Great Leaders Do (John Wiley, New Jersey, 2004).

Severe. Sal. How to Behave So Your Children Will, Too! (Penguin, New York, 2003).

Shenk, David, The Genius in all of Us (Icon Books, London, 2010).

Umari, Akram, As-Sirah al-Nabawiya as-Sahihah (The Authoritative History of the Prophet Muhammad). 2 Volumes (Obeikan Publishing, Riyadh, 1996).

Wheatley. Margaret, Leadership and the New Science (Berrett-Koehler Publishers. New York. 2009).

গার্ডিয়ান পাবলিকেশন্স-এর প্রকাশিত বইসমূহ

ক্রম	বই ও লেখকের নাম	মূল্য
১.	প্যারাডক্সিক্যাল সাজিদ- আরিফ আজাদ	৩০০/-
২.	কয়েকটি গল্প অতঃপর- নাসরিন সুলতানা সিমা	১৩০/-
৩.	হালাল বিনোদন- ইসমাঈল কামদার; মাসুদ শরীফ (অনুবাদক)	১৫০/-
৪.	৫০০০ প্রশ্নোত্তরে সীরাতুন্নবী (সা)- ড. মোঃ আবদুল মান্নান	৪৯০/-
৫.	নেতৃত্বের প্রাথমিক বোঝাপড়া- ড. মুনির উদ্দিন আহমেদ (বাদল)	২০০/-
৬.	মুক্তিযুদ্ধের বয়ানে ইসলাম- পিনাকী ভট্টাচার্য	২৫০/-
৭.	বি স্মার্ট উইথ মুহাম্মাদ (সা)- মাসুদ শরীফ (অনুবাদক)	২৫০/-
৮.	বিয়ে- রেহনুমা বিনত আনিস	২৫০/-

প্রকাশিতব্য বইসমূহ

১. প্যালেস্টাইনের বুকে ইজরাঈল- মোঃ আছাদ পারভেজ
২. আমরা বাংলাদেশি বাঙালি- মোঃ আছাদ পারভেজ
৩. মানবাধিকার ও ইসলাম- প্রফেসর ড. মোঃ নুরুল ইসলাম
৪. জ্বলে উঠো সাহসের মন্ত্রে- আ জ ম ওবায়দুল্লাহ
৫. মহানায়ক এরদোগান এবং নতুন তুরস্ক- হাফিজুর রহমান
৬. আল কুরআনের বিষয়ভিত্তিক আলোচনা- ডা. আবদুল মোমিন
৭. রোহিঙ্গা : অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ- মোঃ আছাদ পারভেজ
৮. ডেসটিনি ডিসরাপ্টেড- তামিম আনসারি (অনুবাদ গ্রন্থ)
৯. বন্ধন– উস্তাদ নুমান আলী খান
১০. বেবিস ডায়েরি (শিশুদের জন্মদিনের ডায়েরি)
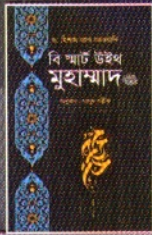
নবিজির ﷺ মতো হওয়া কি খুব সহজ?

রাতে এসে যখন শুনলেন ঘরে খাবার নেই, তখন তিনি নফল সিয়ামের নিয়্যাত করে ফেললেন। আমরা হলে কী করতাম?

প্রথম কয়েক বছর মানুষের কাছ থেকে বারবার প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পরও কীসের বলে নিরলস দীন প্রচার করে গেছেন? কীভাবে অর্জন করলেন অটল মনোবল?

কীভাবে রপ্ত করলেন এক অসম্ভব সুন্দর ভাষা, যা শুনলেই মানুষের হৃদয়ে ছাপ ফেলে দিত?

কেমন ছিল তাঁর শৈশব, কৈশোর, তারুণ্য আর যৌবনের উচ্ছল দিনগুলো?

নবিজির ﷺ জীবনী পড়তে গেলে আমরা সাধারণত তাঁর নবুওয়্যাত পরবর্তী জীবনেই বেশি গুরুত্ব দিই। কিন্তু এর ভিত্তিটা যে মহান আল্লাহ তাঁর নবুওয়্যাত-পূর্ব ৪০ বছরের জীবনে ধীরে ধীরে তৈরি করেছিলেন সেটা কজন ঘেঁটে দেখি?

প্রচলিত অর্থে কোনো সীরাহ বই নয় এটি। কোনো তাত্ত্বিক ঘটনার বিবরণও না। এখানে আপনি পাবেন ব্যবহারিক কিছু জ্ঞান। হাতে কলমে শিখবেন নিজের বাচ্চাকে নবিজির ﷺ মতো করে বড় করার উপায়। টিনএজ বয়সী হলে জানতে পারবেন এই উড়ুউড়ু সময়টাতে নিজেকে বাগে রাখার কৌশল। বিবাহিত হলে আছে দুজনে মিলে জীবনটাকে আরও মধুর করার টোটকা। সর্বোপরি নবিজির ﷺ মতো জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে 'স্মার্ট' হওয়ার তরিকা।

তবে চলুন স্মার্ট হই প্রিয় নবিজির ﷺ মতো...

৩৪, বাংলাবাজার, ঢাকা ১০০০।
www.facebook.com/guardianpubs

ISBN-978-984-92959-5-2